প ঞ্চ ম অ ধ্যা য়

মনসামঙ্গল কাব্যের বিনির্মাণ : চলচ্চিত্র ও অন্যান্য সংরূপ

মনসামঙ্গলের মূল পাঠকে বিনির্মাণ নিয়ন্ত্রিত পাঠ প্রক্রিয়ায় কীভাবে বহুরৈখিক করা যায়, তার একটা যুক্তিনিষ্ঠ প্রচেষ্টা আমরা প্রথম অধ্যায়ে করেছি। আবার পরবর্তী তিনটি অধ্যায়ে নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতার মতো আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান সংরূপগুলিতে সেই মনসামঙ্গলের আদিপাঠ কীভাবে নাকচ হয়ে, বিনির্মাণের পথে নতুন অর্থের দ্যোতনা হয়ে উঠে এসেছে, তা আলোচিত হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করতে আগ্রহী সাহিত্যের পূর্বোক্ত প্রধান সংরূপগুলি ছাড়াও অন্যান্য কোন কোন সংরূপে মনসামঙ্গল কাব্যের বিনির্মাণ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তা নিয়ে। এটা না হলে আমাদের আলোচনার বৃত্তটি সম্পূর্ণ হয় না।

গবেষণার প্রস্তাবনা অনুসারেই আমরা কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটকের মতো সংরূপ ছেড়ে আর কোন কোন সংরূপে মনসামঙ্গলের বিনির্মাণ সম্ভব হয়েছে, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে কতকগুলি সমস্যার সামনে উপনীত হয়েছি। সেই সমস্যার মধ্যে প্রথমেই আমাদের যে বিষয়টি উত্থাপন করতে হচ্ছে, তা হল সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক উপাদানের অভাব। কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস বাদ দিলে যে সংরূপগুলি আমাদের হাতে পড়ে থাকে, সেগুলি মূলত প্রবন্ধ, ভ্রমণ বা ডায়েরি সাহিত্য, চিত্র ও চলচ্চিত্র। অমলেন্দু ভট্টাচার্যের 'মনসামঙ্গল কাব্য : পুনর্বিচার'-এর মতো একটি দুটি প্রবন্ধই আমাদের চোখে পড়েছে, যেখানে মনসামঙ্গলকে ভাঙচুর করে দেখার চেষ্টা হয়েছে। মধ্যযুগের একটি জনপ্রিয় সাহিত্যধারা নিয়ে আলোচনার সীমাবদ্ধতা বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের সমৃদ্ধ বিস্তৃতির মধ্যে কেন দেখা দিল, তা আমাদের বোধগম্য হয়নি। বাংলা প্রবন্ধের জগতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে আলোচনাগুলি আছে, তা মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কাঠামোটি ধরেই অগ্রসর হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলি নেহাতই মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কাঠামোয় দাঁড়িয়ে থেকে নানাকৌণিক ব্যাখ্যা। তাকে ভেঙে নতুন কোনো

পথ পরিগ্রহণ করেনি। এই শীতলতা সংরূপটিতে মনসামঙ্গল কাব্যের বিনির্মাণ নিয়ে আলোচনার অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছে আমাদের কাছে।

একই সমস্যা আমরা অনুভব করেছি ভ্রমণ বা ডায়েরি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও। সেই প্রাসঙ্গিক উপাদানের অভাব। ছবিকে সাহিত্য সংরূপ বলার ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত আপত্তি আছে সমালোচনা মহলে। মনসামঙ্গল কাব্যকেন্দ্রিক পটচিত্র বা সরাচিত্রকে যদি ধরিও, তবু সেই প্রাসঙ্গিক উপাদানের অভাব দূর হয় না। কারণ পট বা সরার মধ্যে মনসামঙ্গলের আদি কাহিনিগুলিই পটুয়াদের দ্বারা অঙ্কিত হয়েছে। মনসামঙ্গলের অনুক্ত কোনো পৃথক তাৎপর্যের এলাকায় তাঁরা আমাদের পৌঁছে দিতে পারছেন না। তাই বিচার বিবেচনা করে আমাদের সুনির্দিষ্ট অন্বেষণ থেকে সেগুলি বাদ দিতে হয়েছে। এখন পড়ে রইল চলচ্চিত্র। সেখানেও অনেক সামালোচক চলচ্চিত্রকে সাহিত্যের এলাকাভুক্ত কোনো সংরূপ ভাবতে আপত্তি জানিয়ে থাকেন।

চলচ্চিত্র যে কারুশিল্প বা ফাইন আর্টসের এলাকা, তা নিয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এটি এমন এক কারুশিল্প, যা সাহিত্য ছাড়া অচল। আমরা তো জানি নাটকও কারুশিল্প। অভিনয়যোগ্যতা ছাড়া নাটকের সাফল্যের কোনো মানদণ্ড নেই। তবু কি আমরা নাটককে সাহিত্য বলব না? মেনে নেব না তাকে সাহিত্য হিসেবে? যদি সেটা মেনে নিতে পারি, তবে সাহিত্য সংরূপ হিসেবে চলচ্চিত্রকেও স্বীকার করে নিতে হয়। আমরা তো জানি নাট্যকার আউগুস্ত বোআলের 'থিয়েটার অফ দ্য অপ্রেসড্' বা 'লেজিসলেটিভ থিয়েটার' বা 'ফোরাম থিয়েটার'-এর মতো ফর্মগুলি লিখিত নাট্যবস্তুর ধার ধারতো না। তা বলে কি সেগুলি নাটক হয়নি! নাকি বোআলের সৃজনকে সাহিত্যের এলাকায় ধরা যাবে না! যদি তা না হয়, তবে চলচ্চিত্রকে সাহিত্যসংরূপ হিসেবে মেনে নিতে আমাদের কোনো উষ্মা থাকার কথা নয়।

নাটকেও মঞ্চ নির্দেশ থাকে। চিত্রনাট্যের মধ্যে থাকে মাউন্টিং, কাট, ডিজলভ, মিড শট, প্যানিং, ফেড ইন, ফেড আউট, মিক্স, ক্লোজ, লং শটের মতো চলচ্চিত্রলগ্ন পারিভাষিক নির্দেশ। আমরা আরও জানাতে চাই, চিত্রনাট্যই চলচ্চিত্রের প্রধান ভিত্তি। আমরা যুক্তি দিয়েই প্রতিষ্ঠা করতে পারি চলচ্চিত্র আর চিত্রনাট্যের মধ্যে খাতা-কলম আর ক্যামেরার পার্থক্য ছাড়া আর কিছুই থাকে না। চিত্রনাট্যের তিনটি স্তর থাকে। চলচ্চিত্র গবেষক ও লেখক গুরুদাস ভট্টাচার্যের প্রদত্ত তথ্য থেকে আমরা জানতে পারছি :

> প্রথমে 'সিনপসিস' : বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত সারাংশ, দ্বিতীয় 'ট্রিটমেন্ট' : প্রয়োগের দিকে লক্ষ্য রেখে বিবৃতি এখানে বিস্তারিত; তৃতীয় স্তরে চূড়ান্ত রূপ 'ট্রিটমেন্ট' : ছবি তোলা সম্পর্কে বিস্তৃত নির্দেশ থাকে এখানে। সুতরাং চিত্রনাট্য আসলে চলচ্চিত্রের পূর্বপরিকল্পিত আক্ষরিক খসরামাত্র।[১]

অর্থাৎ চিত্রনাট্য নিয়ন্ত্রণ করে গোটা চলচ্চিত্রকে। তাকে দক্ষতার সঙ্গে সঠিক ভাবে অনুসরণ করাই চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের কাজ। মঞ্চনির্দেশ যদি সাহিত্যিকের ভাবনালগ্ন উদ্ভাবন হয়, অর্থাৎ তিনি নাটকটিতে যা বোঝাতে চাইছেন, তাকে সঠিক ভাবে উপস্থাপন করার নিমিত্ত কল্পনা হয়, তা হলে চিত্রনাট্যের নির্দেশিকাকেও সাহিত্যলগ্ন ভাবার ক্ষেত্রে অসুবিধা নেই।

অনেকে বলে থাকেন, সমগ্র চলচ্চিত্রকে সাহিত্য সংরূপ ধরা যাবে না। শুধুমাত্র চিত্রনাট্যটিই সাহিত্যের মর্যাদা পেতে পারে, কারণ ওতে লিখিত সাহিত্যিক উপাদান আছে। চলচ্চিত্রকার সের্গাই আইজেনস্টাইন জানিয়েছিলেন :

> চিত্রনাট্য হবে যে-কোনো সাহিত্যের মতোই পাঠযোগ্য; তবে সে পাঠ ছবি-দেখার পদ্ধতিতে। অর্থাৎ চিত্রদর্শন ও চিত্রনাট্যপাঠ, উভয়ের ফলশ্রুতি সমতুল্য।[২]

আসলে নাটক, থিয়েটার, চলচ্চিত্র, এগুলি এমন এক একটা কারুশিল্প, যা সাহিত্যের এলাকাতেও সমাপতিত হয়। কারুশিল্পের ক্ষেত্রে নৃত্যের মতো এগুলি নয়। সাহিত্য এবং চারুকলা, উভয় পরিবারের সদস্য চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্রও সাহিত্যসংরূপ, কেবল তার উপভোগের পথে মাধ্যম হিসেবে ক্যামেরা আর পর্দা থাকে। আমরা বর্তমান পরিচ্ছেদে সেই চলচ্চিত্রে মনসামঙ্গলের বিনির্মাণের সম্ভাবনাগুলি আলোচনা করব। এক্ষেত্রে কিছু উপাদান আমাদের কাছে উঠে এসেছে।

মনসা নামক মঙ্গলদেবী নিজের পূজা প্রচলনের জন্যে যে Tools বা উপকরণগুলি ব্যবহার করেছিলেন, অর্থাৎ ভয় দেখানো বা প্ররোচিত করার মতো বিষয়, সেগুলি অত্যন্ত প্রচলিত উপকরণ বা কনভেনশনাল। লোক দেব-দেবীদের মধ্যে লোকজীবনে শঙ্কার জায়গাগুলি বেছে নিয়ে সেগুলি দিয়েই দড় কষাকষি করার ছবিটা চেনা। মাটিতে পা দিয়ে চলতে চাইলে আর এমন এক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বাস করতে বাধ্য হলে, যেখানে উন্নত চিকিৎসা বা দু'বেলা দু'মুঠো খাওয়া-পরার নিশ্চয়তার অভাব রয়েছে, সেখানে লোক দেব-দেবীদের 'বিভাগীয়' বিষয়গুলির আশঙ্কা থাকা খুব

স্বাভাবিক। সাপে কাটা, ওলাওঠা, গুটি বা জলবসন্ত, খরা, বন্যা, কুষ্ঠ, যৌনব্যাধি, হাম, পোলিও, উদুরি, খোস-চুলকানি-এগজিমা, ঘুসঘুসে জ্বর, খুকখুকে কাশি, যক্ষা, জনডিস, হিস্টিরিয়া এগুলিই লোকজীবনের নরম এলাকা, শঙ্কার এলাকা, সফ্‌ট কর্নার। আর ঠিক এই এলাকাগুলিতেই লোক দেব-দেবীদের প্রকোপ অথবা বরাভয়ের গতায়াত। লোকজীবনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলতে চাইলে (বিশেষত তা ছাড়া সাহিত্যের যেখানে মুক্তি অসম্ভব), সেই লোক দেব-দেবীদের বিষয়গুলিও চর্চায় অন্তর্ভুক্ত করতেই হয়। যে কোনো সৃজন লোকজীবনে যুক্ত করতে চাইলে, অর্থাৎ মুষ্টিমেয়ের জন্য সৃজন না করে গণউপভোগ্য কোনো কিছু সৃজন করতে চাইলে লোকজীবনের ওই নরম আশঙ্কার জায়গাগুলোকে অস্বীকার করা যায় না। বিষয় হিসেবে ওগুলিই তখন প্রিভিলেজড।

চলচ্চিত্র হল এমন এক সংরূপ, যাকে এই গণজীবনের সঙ্গে সংযুক্ত হতেই হয়। এই সৃজন এক কথায় বাজারনির্ভর। আর সেই বাজার একান্ত ভাবে গণনিয়ন্ত্রিত বা গণগ্রহণযোগ্যতার মুখাপেক্ষী। কোনো চলচ্চিত্র নির্মাতা যতই মৌলিক বা ক্ষুরধার বুদ্ধিগ্রাহ্য ছবি তৈরি করুন না কেন, তাঁরও প্রত্যাশা থাকে সেই ছবি যেন জনতা জনার্দন দ্বারা গৃহীত হয়। লোকজীবনে সাপের ভয়ই চলচ্চিত্রে সাপের জয় ঘোষণা করেছে। বাংলা চলচ্চিত্রের জগতে সবথেকে বেশি কোন মনুষ্যেতর প্রাণীকে দেখা গেছে, এমন যদি একটা সন্ধানী প্রশ্ন আমাদের মাথায় আসে, তাহলে প্রথমেই এই সাপের কথাই মনে আসে। চলচ্চিত্র শিল্প সরীসৃপদের মধ্যে সাপকে নিয়েই এত নির্মাণে মনোযোগ দিল কেন? কই কুমীর বা কেঁচো নিয়ে তো তেমন সিনেমা নেই! এর উত্তরেই চলে আসে সেই সত্য। বাংলা চলচ্চিত্র আজও মনসামঙ্গলের লিগ্যাসি বা ঐতিহ্য বহন করে চলেছে।

স্বাধীনতার আগে-পরে এপার আর ওপার বাংলায় প্রচুর সাপ ও মনসা কাহিনি নিয়ে ছবি তৈরি হয়েছে। সত্যি বলতে কি, বাংলা ভাষায় এই ধরণের ছবি বেশি বেশি তৈরি হয়েছে বাংলাদেশেই। এখানে আমরা কালানুক্রমিক কিছু উল্লেখযোগ্য প্রাসঙ্গিক চলচ্চিত্রের উল্লেখ করলাম। 'মহুয়া' (১৯৬৬), 'বেহুলা' (১৯৬৬), 'অরুণ বরুণ কিরণমালা' (১৯৬৮), 'পাতালপুরীর রাজকন্যা' (১৯৬৯), 'মলুয়া' (১৯৬৯), 'আমীর সওদাগর' (১৯৭০), 'ভেলুয়া সুন্দরী' (১৯৭০), 'নাগ নাগিনী' (১৯৭৯), 'শীষ নাগ' (১৯৭৯), 'নাগিন' (১৯৮০), 'নাগিনী কন্যা' (১৯৮২), 'নাগ পূর্ণিমা' (১৯৮৩), 'নাগ রানী' (১৯৮৩), 'পদ্মাবতী' (১৯৮৪), 'রসের বাইদানী' (১৯৮৪), 'চন্দনদ্বীপের রাজকন্যা'

(১৯৮৪), 'জিপসি সর্দার' (১৯৮৪), 'সতী নাগকন্যা' (১৯৮৫), 'নাগমহল' (১৯৮৬), 'চাঁদ সদাগর' (১৯৮৬), 'মহুয়া সুন্দরী' (১৯৮৭), 'নাগজ্যোতি' (১৯৮৮), 'সর্পরানী' (১৯৮৮), 'বেহুলা লখিন্দর' (১৯৮৮), 'জলপরী' (১৯৮৯), 'বেদের মেয়ে জোসনা' (১৯৮৯), 'সাপুড়ে মেয়ে' (১৯৮৯), 'সাগরকন্যা' (১৯৮৯), 'নাচে নাগিন' (১৯৯১), 'শীশমহল' (১৯৯১), 'বনবাসে বেদের মেয়ে জোসনা' (১৯৯১), 'রূপসী নাগিন' (১৯৯২), 'নাগিনী সাপিনী' (১৯৯২), 'নাগপঞ্চমী' (১৯৯৪), 'নাগ নাগিনীর স্বপ্ন' (২০০৯)। এই ধারা আজও চলমান। তবে সাত, আট বা নয়ের দশকে যত এইধরনের ছবি তৈরি হয়েছে এখন ততটা হয় না। তারও কারণ আমরা সন্ধান করেছি। আমরা আলোচনা করেছি সাপের দৃষ্টি, সাপের মণি, সাপের লেজ খসা ইত্যাদি বিষয়গুলিও কীভাবে বাংলা ছবিতে বিনির্মিত হয়েছে। এই সংরূপের মধ্যে বিনির্মাণ আলোচনার জন্য আমরা কতকগুলি বাংলা ছবি বেছে নিয়েছি। এই অধ্যায়ে আমরা চারটি পরিচ্ছেদ সংযুক্ত করেছি। এখানে আমরা চলচ্চিত্রে মনসামঙ্গলের বিনির্মাণের একটা সামগ্রিক আলোচনায় অগ্রসর হয়ে চেয়েছি। কারণ আমরা দেখেছি মনসামঙ্গলের ঐতিহ্য একটা সুনির্দিষ্ট পথেই ভাঙা হয়েছে চলচ্চিত্রে। সেই ভাঙার বিভিন্ন দিক চারটি পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে।

প্র থ ম প রি চ্ছে দ

চলচ্চিত্রে মনসামঙ্গল কাব্যের বিনির্মাণ : আক্রান্ত রাজনৈতিক ধর্ম

প্রথমে আমরা আলোচনা অগ্রসর করতে চাই শেখ নজরুল ইসলাম পরিচালিত বাংলাদেশে ১৯৮০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছায়াছবি 'নাগিন'[৩]-কে কেন্দ্র করে। কাহিনি, সংলাপ, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করাচ্ছেন শেখ নজরুল ইসলাম। ছবিটিতে অভিনয় করেছেন রাজ রজ্জাক, শওকত আকবর, গোলাম মোস্তাফা, রাজীব, সুচরিতা, নূতন, বাবর প্রমুখ বাংলাদেশ ফিল্ম ইন্ডাসট্রির জনপ্রিয় শিল্পীবৃন্দ। ছবিটির কাহিনি শুরুই হয় দুটি ছোট্ট বাচ্চা ছেলে-মেয়েকে দিয়ে। একজন জমিদারকন্যা জেবা। অন্যজন নায়েবপুত্র সেলিম। তারা পরস্পরের খেলার সঙ্গী।

শুরুতেই দেখি জেবা ভেলায় চড়ে অজানা দেশে চলে যেতে চেয়েছে। আর তার সঙ্গী সেলিম জানিয়েছে সেও যাবে জেবার সঙ্গে ওই ভেলায়। জমিদার আলম চৌধুরী (ছবিতে শওকত আকবর) একজন উন্নত চরিত্রের প্রজাদরদী মানুষ। তিনি তাঁর

সেবকদেরও তাঁর সামনে মাথা নত করতে দেন না। তিনি মনে করেন এতে করে মানুষের মর্যাদার অপমান হয়। অপরদিকে তাঁর নায়েব মাহতাব (এখানে গোলাম মোস্তাফা) একজন দুশ্চরিত্র এবং প্রবল অত্যাচারী। প্রজা চাষাদের অজগরের খাঁচায় ভরে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে তাঁদের ঘরের মেয়েদের ইজ্জত লুঠ করে চলেন। তাঁকে ক্রমাগত আরও পাপ কাজে অনুপ্রাণিত করে চলে তাঁর সঙ্গিনী। একদিন নিজের জলসাঘরে এক অসহায় চাষাকন্যাকে ধর্ষণের সময় জমিদারের কাছে হাতেনাতে ধরা পরেন মাহতাব। চাবুকের ঘা দিয়েই ক্ষান্ত হন না ধার্মিক জমিদার; সেই মুহূর্ত থেকে জমিদারির দেখভালের সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নেন প্রজাদের এই ধরণের পাষণ্ডের থেকে রক্ষা করার জন্যে। পথের ধুলো থেকে জমিদারের দয়ায় নায়েব হয়ে ওঠা মাহতাব সেই মুহূর্ত থেকেই জমিদারকে 'সাপের' মতো বিষাক্ত দংশন করার জন্য পরিকল্পনা করতে থাকেন। এক্ষেত্রে তাঁর উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে তিনি এক সাপুড়ের শরণাপন্ন হন। সাপুড়ে জমিদারকে খুন করার মতো পাপ কাজে ইচ্ছুক না হলেও সাপুড়েজায়া মাহতাবের প্রলোভনে প্রমত্ত হয়ে প্ররোচিত করেন সাপুড়েকে সাপের সাহায্যে দংশন করিয়ে খুন করার জন্যে। সাপুড়ে জমিদার বাড়ির দক্ষিণ জানালায়, যেখানে জমিদার শয়ন করেন, সেখানে নাগিনকে (যার বিষ কোনো সাপুড়ে নামাতে পারেন না) মনসার দোহাই দিয়ে পরিচালিত করেন পরিকল্পনা মতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন জমিদারের বিছানায় জমিদারের স্থানে শয়ন করেছিল জমিদারকন্যা জেবা আর নায়েবপুত্র সেলিম। নাগিন দংশন করল জেবাকে। সাক্ষী লোপাটের নিমিত্তে মাহতাব খুন করে দিলেন সাপুড়েকে। জেবাকে সেই ভেলাতেই ভাসিয়ে দিতে হল, যে ভেলায় একদিন সে ভেসে যাওয়ার স্বপ্ন দেখত।

এর পরেই শুরু হয় ছায়াছবির দ্বিতীয় পর্ব। সাপুড়ে সর্দার (এখানে রাজীব) জলে জঙ্গলে বীণ বাজিয়ে ঘুরে বেড়ান নাগিনকে ধরার জন্যে। কারণ নাগিন মহামূল্যবান সাপ। তার কাছে থাকে গুপ্তধনের সন্ধান। সেই সাপুড়ে সর্দার উদ্ধার করেন জেবার মৃতদেহ। তাকে নিয়ে যান এক সাধুর কাছে। মাটির উপর শুধুমাত্র মুণ্ডুটুকু জেগে থাকা বিচিত্র সাধুর নির্দেশমতোই পরিচালিত হয়ে সর্দার নাগিনকে ডেকে আনেন। ফুলের মতো নিষ্পাপ জেবাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দংশন করার জন্যে নাগিনকে বাধ্য করেন বিষ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যে। জেবার মাধ্যমেই সাপুড়ে সর্দারের ভাগ্য উদ্ধার হবে জেনে সাপুড়ে জেবাকে পালন করতে থাকেন দুলি (ছবিতে সুচরিতা) নাম দিয়ে। অন্যদিকে কন্যা শোকে পাগল জমিদারের কাছ থেকে ছলনায় সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে মাহতাব

তাঁকে কারাগারে বন্দি করে ফেলেন ও নিজে জমিদার হয়ে পূর্ববৎ অত্যাচার চালাতে থাকেন।

সেলিম কিন্তু খুঁজে ফেরে তার জেবাকে। অন্যদিকে সাপুড়ে সর্দারের দুই মাতৃহারা ছেলে-মেয়ে চম্পা ও রমজানের সঙ্গে বড় হয়ে ওঠে দুলি। চম্পা (নূতন) সখ্য ভাব বজায় রাখলেও ক্রমে রমজান (বাবর) দুলির প্রতি দুর্বল বোধ করতে থাকে। তাকে বিবাহ করতে চায়। ইতোমধ্যে একদিন বিতণ্ডার মধ্য দিয়ে সেলিম আর দুলির দেখা হয় এবং দুজনেরই দুজনকে মনে ধরে। এর পরেই আমরা দেখি সেলিম সর্পদষ্ট হয়েছে। সাপুড়েরা তার বিষ মোচন করতে ব্যর্থ হলে তাকে নিকটবর্তী মাজারে নিয়ে যাওয়া হয়। আল্লার কাছে সর্দার, দুলি, চম্পা ফরিয়াদ গেয়ে সেলিমকে সুস্থ করে তোলে। এই ঘটনায় দুলি আর সেলিমের ভালোবাসা আরও গভীর হয়। জমিদার মাহতাব সাপুড়ে পরিবারকে খুশি হয়ে সম্পত্তি দিয়ে যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে স্থায়ী বসবাসকারী হওয়ার প্রস্তাব দেন। সাপুড়ে সর্দার এতে সম্মত হলে খুশি হল সেলিম ও দুলি। তখনো সেলিম জানে না এই দুলিই তার হারিয়ে যাওয়া জেবা। মেলামেশার সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় দুলি সেলিমের মেলামেশা বেড়ে গেল। যা অখুশি করল রমজানকে। তার মধ্যে ধীরে ধীরে একজন পরশ্রীকাতর প্রতিনায়কের জন্ম নিতে থাকল। সে উদগ্রীব হয়ে ওঠে সেলিম আর দুলির প্রেম বিনষ্ট করে দুলিকে দখল করতে। ক্রমে মাহতাবও সাপুড়ে পল্লীতে সেলিমের যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। কিন্তু অভিসার চলতে থাকে সেলিম আর দুলির। রমজান সে তথ্য জেনে নিয়ে দুলিকে সেলিমের উপহার দেওয়া আংটিটি কেড়ে নেয়। সেই আংটি উদ্ধার করতে গিয়ে দুলি রমজানের হাতে ধরা পড়ে। সে দুলিকে পুনরায় প্রেম নিবেদন করে এবং জোর করে দুলিকে ভোগ করতে উদ্যত হয়। ক্রোধান্বিত দুলির শৈশব ভবিষ্যতবাণী মোতাবেক নাগিন জেগে ওঠে। দুলিকে ভোগ করতে না পারলেও রমজান এতে খুশি হয়। সেও সাপুড়ে। সে বুঝতে পারে যে নাগিনি একদিন দুলিকে দংশন করেছিল, সেই নাগিন এখন দুলির মধ্যেই রয়েছে। যে নাগিনের সন্ধানে সাপুড়েরা সাত জন্ম তপস্যা করে, সেই নাগিন তার এত কাছে! বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই রমজান সাপুড়ে সর্দারের থেকে মানুষ থেকে বেজিতে রূপান্তরিত হওয়ার মন্ত্র শিখে নেয়। সর্দার মনস্থির করেন রমজানকে কাবিলার পরবর্তী সর্দার করবেন। কিন্তু তিনি যখন দুলিকে ধর্ষণোদ্যত রমজানকে হাতেনাতে পাকরাও করেন, তখন রমজানকে কাবিলা থেকেই বহিষ্কার

করেন। রমজান যোগদান করে মাহতাবের দলে। এখন সে আর প্রতিনায়ক নয়, পরিপূর্ণ ভিলেন হয়ে উঠেছে।

রমজানের কাছ থেকে দুলি-সেলিমের সম্পর্কের কথা শুনে, দুলিই যে তাঁর সন্তানের দুর্বলতা, একথা অনুধাবন করে মাহতাব নিজের সন্তানকে স্থানান্তরে বন্দি করে রমজানকে দায়িত্ব দেন সাপুড়ে সর্দার আর দুলিকে হত্যা করার। রমজান পাতালমণি সাপের সহায়তায় দুলিকে হত্যা করার জন্যে সাপের দল পাঠায়। কিন্তু দুলি নাগিনি শরীরে সে আক্রমণ প্রতিহত করে। প্রতিহত মাহতাব নিজের লোকলস্করকে নির্দেশ দেন সাপুড়ে পল্লী অগ্নিসংযোগে ধ্বংস করতে। এইবার দুলি আত্মসমর্পণ করে। সে জানায় সে আর সেলিমের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না। মাহতাব তাকে রমজানের হাতে সমর্পণ করেন। কিন্তু দুলি রমজানের কাছে আত্মসমর্পণ করে না। সে নাগিনে পরিণত হয়। রমজান পরিণত হয় বেজিতে। শুরু হয় লড়াই। সেলিমকে একা দুলি ভালোবাসত না। চম্পাও ভালোবাসত দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বন্ধু দুলির জন্য সে ত্যাগ স্বীকার করেছে। এখন এই বিপদকালে সে সাপের মুখ দিয়ে সেলিমের কারাগারে চিরকুট পাঠায়। সেলিম কারাগার থেকে বেরোনোর জন্যে কারারক্ষীদের সঙ্গে লড়াই চালাতে থাকে। সেখানেই চম্পার মৃত্যু হয়। অন্যদিকে রমজান আর দুলির লড়াই চলাকালে মৃত্যু হয় মাহতাবের।

কারারক্ষীদের সহায়তায় জমিদার আলমও মুক্ত হন। মিলিত হন সাপুড়ে সর্দারের সঙ্গে। সাপুড়ে সর্দার জানতে পারেন তাঁর দুলিই আসলে জমিদারের জেবা। দুলির দংশনে মৃত্যু হয় রমজানের। ভবিষ্যতবাণী মোতাবেক সেই কারণেই দুলি ওরফে জেবা তখন বেহুঁশ হলেও নাগিনের প্রভাবমুক্ত। ইতোমধ্যে সেলিমও জেনে গেছে দুলিই তার সেই হারিয়ে যাওয়া জেবা। অতঃপর জেবার চেতনা ফিরে আসা ও সেলিমের সঙ্গে মিলনে শুভসমাপ্তি।

সমস্ত কাহিনিটা আমরা সংক্ষেপে বিবৃত করলাম, কারণ টেক্সট আকারে এর কাহিনি পাওয়া যায় না। এখন এই কাহিনির মধ্যেই আমরা সহজে মনসামঙ্গলের ভাঙা গড়া লক্ষ করতে পারব। কাহিনিটিতে দুটি কোল্যাটারাল ড্যামেজ আছে। একটি চম্পার মৃত্যু। অন্যটি মাহতাবের মৃত্যু। কারণ এদের মৃত্যু ঘটানোর নিমিত্তে কাহিনি অগ্রসর হয়নি। লড়াইয়ের মাঝে পড়ে এদের মৃত্যু হয়েছে। চম্পার মৃত্যু আসলে বেদনামুক্তি। অন্য দিকে মাহতাবের মৃত্যু পোয়েটিক জাসটিস।

আমরা আলোচনার প্রথমেই একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলাম। সেটা হল বাংলা ছায়াছবিতে সাপকে নিয়ে যত চর্চা হয়েছে, ততটা অন্য কোনো সরীসৃপ নিয়ে হয়নি। তার কারণটা বর্তমান আলোচ্য ছবিটিতে খুব সহজেই আমাদের নজরে আসে। প্রথমত ছবিটির কাহিনিতে কোনো জটিল বাঁক নেই। কাহিনির কেন্দ্রে নিঃসন্দেহে জেবা। সে যখন যেদিকে থেকেছে, সেদিকেই কাহিনি পরিচালিত হয়েছে। এবং সেটাও অনেকটা সরলরৈখিক পথে। কাহিনিটিতে আমরা লক্ষ করি কতকগুলি সিনেমাটিক লোকউপাদান রয়েছে। সর্পদষ্ট মৃতদেহকে ভেলায় ভাসানো, সাপুড়ে ও ওঝা, নাগিনের বীণ, সাপের দংশন ও বিষতোলা, সাপ-বেজির লড়াই, মন্ত্রশক্তি, সাধুবাবা, মাজার ইত্যাদি। এগুলি মনসামঙ্গলেও ছিল। আমাদের মনে রাখতে হবে এই ছবির দর্শক এমন এক জনতা, যাদের যাপনের মধ্যে এই লোকউপাদানগুলি অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত হয়ে আছে। আমরা যাকে জনতা বলছি, তাঁরা তাঁদের জীবনের অনুষঙ্গগুলি পর্দায় দেখতে একটা মানসিক সমর্থন পান। তাই তাঁরা ভিড় করে দেখতে আসেন এই সব ছায়াছবি। সাপের মতো ভয় ও এতখানি লগ্ন বিশ্বাস অন্যান্য মনুষ্যেতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে নেই বাঙালির। তাই সাপ নিয়ে এত ছবি। এবং সেই ছবির জনপ্রিয়তাও। এই মানসিক পরিস্থিতি একদিন মনসামঙ্গল কাব্যের সৃজন ও বিস্তারও নিয়ন্ত্রণ করত। তাই সেকালের মনসামঙ্গল যে আঙ্গিকে পরিবেশন করা হত, প্রযুক্তির উন্নয়নে তাইই পর্দায় উঠে এসেছে। উপভোক্তার মানসিকতা একই আছে। শুধু যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাধ্যমটি বদলেছে। এগুলিই একালের মনসামঙ্গল। খুব একটা কাঠামোর বদল নেই। ফলে একে পুনর্নির্মাণ বলতেই পারি। তাহলে আমরা বিনির্মাণের আলোচনায় এই ছায়াছবিটিকে অন্তর্ভুক্ত করছি কেন? করার কারণ আছে। আসলে সেটা অনুধাবন করার জন্যে আর একটু গভীরে নজর দিতে হয়।

প্রত্যেকটি ধর্মের একটা রাজনৈতিক আর একটা সামাজিক দিক আছে। ধর্মের সামাজিক জায়গায় বিভেদের সম্ভাবনা খুব দুর্বল। যদি কোনো মুসলিম কোনো পোড়ো মন্দিরের সাধুবাবার প্রদত্ত মাদুলি নিয়ে সুরক্ষিত বোধ করেন, তবে তা সামাজিক ইসলামের চর্চা। কোনো হিন্দু যদি মাজারের জলপড়ার মধ্যে রোগমুক্তি খোঁজেন, তবে তা সামাজিক হিন্দুত্বের চর্চা। অপরদিকে যে প্ররোচনা থেকে হিন্দুটি বা মুসলিমটি দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়ছেন, ধর্মান্তরিত করতে চাইছেন, আক্রমাণাত্মক হয়ে উঠছেন ধর্মের কারণে, সেটি হয়ে যাচ্ছে রাজনৈতিক ইসলাম বা হিন্দুত্বের চর্চা।

বাংলাদেশের অনেক নামজাদা সমালোচক যখন সেখানকার ছায়াছবিতে এই মনসা লিগ্যাসিকে আক্রমণ করে বিভিন্ন মাধ্যমে লেখালিখি করেন, তখন আমরা বুঝতে পারি এই সব ছবিতে তাঁদের রাজনৈতিক ইসলামকে আক্রান্ত বোধ করছেন। আবার মনসামঙ্গলে যখন কাজীদলনের মতো অংশ অন্তর্ভুক্ত হতে দেখি, তখন বুঝি মঙ্গলকবিদের রাজনৈতিক হিন্দুত্ব আক্রান্ত বোধ হয়েছে কবিদের কাছে সমকালীন মুসলিম শাসনের সমকালে। কিন্তু এই সব কিছুর পরেও হিন্দুরা সাপে কাটা প্রিয়জনকে মাজারে নিয়ে গেছেন ঝাড়ফুঁক করতে। মুসলমান মনসার থানে পুজো দিয়েছে তাঁর প্রকোপ থেকে বাঁচতে। এটাই আমাদের কাছে সামাজিক হিন্দুত্ব ও সামাজিক ইসলাম। আমাদের মতে রাজনৈতিক হিন্দুত্ব বা রাজনৈতিক ইসলামের কোনোটাই ছায়াছবি নির্মাতাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁরা জনতার সৃজন করেন। সে জনতা হিন্দুও, মুসলমানও। ফলে তাঁরা তাঁদের মনসামঙ্গলকে সামাজিক হিন্দুত্ব ও সামাজিক ইসলামের কাছে নিয়ে গেছেন। মনসামঙ্গলের বিনির্মাণের সেই পাঠটি আমরা 'নাগিন' ছায়াছবিটিতে পূর্ণ মাত্রায় পেলাম। প্রথমে দেখলাম মাহতাবের কথায় নাগিনকে জমিদারের শয়নকক্ষে চালনার জন্যে সাপুড়ে 'মা মনসার' দোহাই দিচ্ছে। ঘটনাক্রমে জেবা নাগিনে আক্রান্ত হলে মুসলিম ওঝা এসেছে বিষ তুলতে। সেই জেবাকে উদ্ধার করে মুসলমান সাপুড়েকে দেখলাম সাধুর থানে নিয়ে যেতে। আবার সেলিম সর্পদষ্ট হলে তাকে নিয়ে আসা হয়েছে মাজারে ফরিয়াদ করতে। আবার রমজান যখন দুলিকে আর সাপুড়ে সর্দারকে হত্যা করার জন্যে সাপ পাঠিয়েছে, বা প্রাথমিক ভাবে ব্যর্থ হয়ে পাতালমণির সঙ্গে হাজার হাজার সাপ পাঠিয়েছে, তখন মুসলমান সাপুড়ে সর্দারকে বারবার মনসার নাম স্মরণ করতে দেখি। জেবার মধ্যে নাগিন বাসা বাঁধে মনসার মোটিফে। সাপের নারী রূপায়নের ঐতিহ্য সন্দেহাতীত ভাবেই মনসামঙ্গলের থেকে এসেছে। মনসার আগে কোথাও সর্পদেবী বা সর্পমানবীর সন্ধান পাই না আমরা। আর ছায়াছবির সামগ্রিক রূপায়নটি একাধারে মনসামঙ্গলের রাজনৈতিক হিন্দুত্ব এবং সমকালীন রাজনৈতিক ইসলামকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। বিনির্মাণটাও ঘটে সেখানেই।

বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা মনসামঙ্গলের ঐতিহ্য বহনকারী বাংলা চলচ্চিত্রে কীভাবে হিন্দু আর ইসলাম ধর্মের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি আক্রান্ত হয়েছে তা আলোচনা করেছি। আলোচনা করেছি ধর্মের সামাজিক অভিমুখ কীভাবে বিপর্যস্ত করেছে তার রাজনৈতিক গোপন ইস্তেহারকে। আমরা উচ্চারণ করেছি কীভাবে চলচ্চিত্রের এই

অবস্থান বিরক্ত করেছে কায়েমী রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের। এখন আমরা এখানে উল্লেখ করতে চাই, বর্তমানে এপার বাংলা বা ওপার বাংলার চলচ্চিত্র ইন্ডাসট্রির মধ্যে আর এই ধরণের ছায়াছবি নির্মিত হচ্ছে না। হলেও এত নগন্য তার আয়োজন, যে সেগুলি চলচ্চিত্র পদবাচ্য হয়ে উঠছে না। তার কারণ সন্ধান করতে গিয়ে আমাদের মনে হয়েছে, বর্তমান বিশ্বে পুনরায় একটা মৌল রাজনৈতিক অবস্থান পোক্ত হচ্ছে।

বাংলাদেশ বা এপার বাংলাতেও তার চলমানতা চোখে পড়ার মতো। মন্দির-মসজিদ ভেঙে ফেলা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাব, মুক্তমনা সাংবাদিক ও ব্লগারদের এক এক করে হত্যা করে ফেলা---এই সব ঘটনা সেদিকেই নির্দেশ করছে। মুসলমান গাইবে মনসার জয়গান, হিন্দু গিয়ে মাজারে ফরিয়াদ জানাবে, এই ধরণের ছবিগুলিতে যা খুবই দেখা যায়, তা পছন্দ হচ্ছে না বর্তমান রাজনৈতিক ধর্মের। তাদের রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় শক্তি বেড়েছে প্রচুর। ফলে তাদের ইচ্ছেগুলোই মান্যতা পাচ্ছে। রাষ্ট্রের এই পৃষ্ঠপোষকতার কারণ আছে নানারকম। বিপুল অঙ্কের অর্থ লগ্নি হচ্ছে প্রতিরক্ষা খাতে। অস্ত্রব্যবসায়ীদের বিপুল চাপ আছে সরকারগুলির উপর। এখন যুদ্ধের আবহ না থাকলে এই সমস্ত আয়োজন মুখ থুবড়ে পড়ার কথা। তাই যে উগ্র জাতীয়তাবাদের উপর নির্ভর করে বিশ্বযুদ্ধগুলো সম্ভবপর করে তোলা গিয়েছিল, তাকে জীবন্ত রাখতেই হবে। ধর্মের রাজনৈতিক দিকটি সেদিক থেকে ধনাত্মক ভূমিকা পালন করে ভীষণভাবে। ধর্মের রাজনৈতিক দিকটির মতো মাদকতা, বুদ্ধিলোপকারী শক্তি জগতে দুটি নেই। ফলে একে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতার যথেষ্ট কারণ অনুমেয়। এরা কোনোভাবেই চাইবে না মনসার থানে মুসলমান 'পুজো' দিক। চাইবে না হিন্দু আসুক পীরের মাজারে। তাই এরা এই ধরণের চলচ্চিত্রের একদম বিপক্ষে।

অন্যদিকে উচ্চকটির সামাজিকদের এই ধরণের ছবি নিয়ে একটা অভিযোগ বিশ্বায়ন পরবর্তীকালে খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। ছবির নামে এই সমস্ত ক্ষেত্রে নাকি কুসংস্কারের প্রচার চলে। লোকজীবনের প্রতি শিষ্টজনের সবসময়ই একটা উচ্চ-নাসিকা অবস্থান চোখে পড়েছে আমাদের। তাঁরা সবসময়ই চেয়েছেন লোকজীবনের সংশ্লিষ্ট ধারাগুলির বিলুপ্তি। তার জন্যে তাঁরা শক্তি প্রয়োগ করেননি। বরং মনস্তাত্ত্বিক পথ অবলম্বন করেছেন। সে পথ উপেক্ষা, অস্বীকৃতি, উপহাস-বিদ্রুপে আকীর্ণ থেকেছে। এই উপায়গুলি যেকোনো জায়মান বিষয়কেই ভেতর থেকে শেষ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। সিঙ্গেল স্ক্রিন থেকে প্রেক্ষাগৃহগুলির মাল্টিপ্লেক্সে উত্তরণ হচ্ছে। ইন্ডাস্ট্রি আরও বেশি শিষ্টজন মুখাপেক্ষী হয়ে উঠছে। ঝকঝকে লোকেশন ও

হাইডেফিনেশন ছবিতে সাপ-খোপের আর গর্ত খোঁজা সম্ভব হচ্ছে না। সেখানে অনেক বেশি আরবান জটিলতা জায়গা করে নিচ্ছে। আমাদের মধ্যে প্রশ্ন জাগে, যদি কুসংস্কার বৃদ্ধি করে এমন আশঙ্কায় সাপের মণি, ওঝা, ইচ্ছাধারী নাগরা চলচ্চিত্র থেকে ব্রাত্য হতে পারে, তবে হিংসাসর্বস্ব অ্যাকশন ছবি কেন ব্রাত্য হচ্ছে না? কেন বাদ পড়ছে না অন্যরকম ভ্রান্তি থেকে গড়ে ওঠা ভুত-প্রেতের হরর ছবি? আমাদের এর উত্তরে মনে হয়েছে গা ছমছম শিষ্টজনেরও করে। আর মারামারির দুনিয়াটা তো গোটাটাই নিয়ন্ত্রিত হয় তথাকথিত 'শিষ্ট'-দের দ্বারা। লোকজীবনের সঙ্গে তার যোগ নেই। ফলে বেশি দামের টিকিট কেটে 'শিষ্ট' দর্শকের তথাকথিত 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন' ছবি দেখতে ইচ্ছে শুকিয়ে যাওয়া যদি এই ধরণের চলচ্চিত্র নির্মাণের পথে একটা বাধার দিক হয়ে থাকে, তবে ধর্মের মৌল রাজনৈতিক চেতনার বৃদ্ধি এই ধরণের চলচ্চিত্রের অন্তর্জলী যাত্রার পথ প্রশস্ত করার একটা বড় দিক।

দ্বি তী য় প রি চ্ছে দ

চলচ্চিত্রে উল্টোস্রোত : পরাজিত কালনাগিনী, জয়ী লখিন্দর

আমরা দ্বিতীয় ছবি আলোচনার জন্যে নির্বাচন করেছি 'নাগপূর্ণিমা'[৪]। সোহেল রানা, ববিতা, রোজিনা, আদিল অভিনীত এবং মাসুদ পারভেজ (সোহেল রানাই মাসুদ পারভেজ নাম নিয়ে প্রযোজনা করতেন 'পারভেজ ফিল্মস' প্রোডাকশন হাউস থেকে) প্রযোজিত এই ছবিটি বাংলাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ছবিটির কাহিনি ও সংলাপ রচনা করেছেন সাহিদুর রহমান কুটু। এক একটি প্রেক্ষাগৃহে প্রায় ১৬-১৮ সপ্তাহ পর্যন্ত চলেছিল ছবিটি। ছবিটিতে আলম খানের সঙ্গীত পরিচালনায় অ্যান্ড্রু কিশোরের কণ্ঠে গাওয়া 'তুমি যেখানে আমি সেখানে সেকি জানো না' গানটি এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে বাংলাদেশের জনপ্রিয়তম ছায়াছবির গানগুলির মধ্যে আজও গানটিকে স্মরণ করা হয়। ছবির তিন কুশীলব সোহেল রানা, ববিতা এবং রোজিনা বাংলাদেশের চলচ্চিত্র জগতে অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়া যদি এই ছবির জনপ্রিয়তার একটা দিক হয়, তবে এই ছবির বিষয়বস্তু সেই জনপ্রিয়তার আর একটা দিক, সেকথা আমাদের মেনে নিতেই হবে। এই ছবির মধ্যেও মনসামঙ্গলের ঐতিহ্য থাকলেও ছবিটির কাহিনিবৃত্ত পূর্বে আলোচিত ছবি 'নাগিন'-এর থেকে অনেক জটিল।

'নাগিন' ছবির মতোই এই ছবির শুরুও হচ্ছে দুটি বাচ্চার খেলার দৃশ্যায়ন দিয়ে। সাপুড়ের দুই ছেলে-মেয়ে নিজেদের মধ্যে খেলার সময় তাদের পক্ষীশাবকটি হাত ছাড়িয়ে চলে যায়। তাকে অনুসরণ করে বাচ্চা মেয়েটি, যার নাম ছবিতে রূপা। সেই পক্ষীশাবকটি শিকার করে কালনাগিনী। শাবকটিকে মুক্ত করার জন্যে মেয়েটি তাকে একটি গাছের শুকনো কাঠি দিয়ে প্রহার করতে উদ্যত হলে কালনাগিনী মেয়েটিকে দংশন করে। ক্রমে মেয়েটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সাপুড়েও প্রতিজ্ঞা করেন তাঁর সন্তানের হত্যার প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত তিনি অন্ন-জল গ্রহণ করবেন না। তিনি জলে জঙ্গলে কালনাগিনীর গর্ত খুঁজতে শুরু করেণ বীণ বাজিয়ে। এক সময় তিনি আবিষ্কার করেন কালনাগিনীর বাসস্থান। তাঁর বীণের প্রভাবে কালনাগিনীর বাসা থেকে তার শাবকটি নির্গত হওয়া মাত্র সাপুড়ে সেটিকে মাটিতে আছড়ে মেরে ফেলে। এই সব ঘটনাই কালনাগিনী প্রত্যক্ষ করে, এবং সাপুড়েকে জানিয়ে দেয় এর প্রতিশোধে সে সাপুড়ের ছেলে মঙ্গলকেও মেরে ফেলবে। সাপুড়েকে নির্বংশ করবে। ছেলেকে বাঁচাতে এর পর সাপুড়ে মঙ্গলকে প্রাথমিক ভাবে সাপের একটি রক্ষাকবচ বেঁধে দিয়েই এক সাধুবাবার কাছে ছেলের প্রাণরক্ষার উপায় জানতে হাজির হয়।

সাধুবাবা সাপুড়েকে জানান, কালনাগিনী প্রতিশোধ নেব বলে প্রতিজ্ঞা করলে শতবর্ষ পরেও প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়ে। সেক্ষেত্রে উপায় একটিই। প্রতিদিন তিল পরিমাণ কালনাগের বিষ দ্বাদশবর্ষব্যাপী মঙ্গলকে খাওয়াতে হবে এবং বেঁধে রাখতে হবে রক্ষাকবচ। এই দ্বাদশবর্ষের মধ্যে কখনো যদি মঙ্গলকে সর্পদংশন করে, তবে তার পরের পূর্ণিমা থেকেই ঘটতে থাকবে অঘটন। সাপুড়েও জানান তিনি মঙ্গলকে কখনো সাপের কাছে যেতে দেবেন না। এই ভাবেই চলতে থেকে মঙ্গলকে বিষ খাওয়ানো এবং কবচ দিয়ে কালনাগিনীর থেকে সতর্ক রক্ষা। অতি খারাপ সেই বিষ মঙ্গল খেতে চায় না। কিন্তু যখন সাপুড়ে জানায় সেই 'ওষুধ' মঙ্গল না খেলে সে আত্মহত্যা করবে তখন মঙ্গল সবটুকু খেয়ে নেয়। দয়া-মায়ায় পূর্ণ মঙ্গল বেড়ে উঠতে থাকে ধীরে ধীরে। কালনাগিনীও সুযোগের অপেক্ষায় থাকে নিজের প্রতিশোধবাসনা পূরণের।

কাহিনির এই চলমানতার মধ্যেই আরও একটি তরঙ্গ এসে যুক্ত হয়। সেটি হল লাচির কাহিনি। লাচি মঙ্গলের বন্ধু। সে মঙ্গলের সঙ্গেই খেলতে পছন্দ করে। কিন্তু এই বিষয়টি আবার পছন্দ নয় সাপুড়ে সর্দারের নাতি শেরুর। সে মনে করে লাচি তার সম্পত্তি, এবং তার সঙ্গে ছাড়া আর কারও সঙ্গে লাচির খেলার অধিকার নেই।

ছোটবেলা থেকেই একটা কমপ্লেক্স শেরুর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি আমরা, যা তাকে পরবর্তীকালে ভিলেনে রূপান্তরিত করবে। সে নিজের চাহিদার বাইরে আর কিছুই দেখতে পায় না। কিন্তু সাপুড়ে সর্দার একেবারেই তাকে সেই ধরণের কোনো শিক্ষায় বড় করতে চান না। তিনি ন্যায় বিচারক। শেরু অন্য বাচ্চাকে প্রহার করেছে জানতে পারলে তিনি যথাযথ শাসন করেন। কিন্তু সেই সব শিক্ষা শেরুকে প্রভাবিত করে না। সে আরও প্রতিশোধপ্রবণ হয়ে ওঠে। এই ভাবেই সেও বড় হয়ে ওঠে।

মঙ্গল (সোহেল রানা) ও লাচির (ববিতা) মধ্যে বন্ধুত্ব ক্রমে প্রেমে রূপান্তরিত হয়। অন্যদিকে শেরু (আদিল) হয়ে ওঠে আরও খলচরিত্র। সে লাচিকে গ্রাস করতে চায়। আর সেই পথে কাঁটার মতো মঙ্গলের উপস্থিতি সে মেনে নিতে পারে না। তাই ক্রমাগত মঙ্গলের ক্ষতি করতে চায় শেরু। মেরে ফেলতে চায় শেরুকে। আর এই কাজে তার সহায়ক হয়ে ওঠে এক লোলুপ ভোগী জটাধারী শয়তান তান্ত্রিকবাবা। তার কাছে দীক্ষা নেয় শেরু। তার শাকরেদদের সাহায্যে সে চালাতে থাকে ধর্ষণের মতো জঘন্য কাজ। যদিও সে জানে কাবিলায় নিয়ম আছে সেখানকার কোনো মেয়ে যদি অসতী বলে প্রমাণিত হলে যেমন তার মাথা কেটে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়, তেমনি কোনো পুরুষ ধর্ষক প্রমাণিত হলে তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। সর্দারের কাছে তার অপকর্মের অভিযোগ পৌঁছানোর সমস্ত পথ সে তার শাকরেদদের দিয়ে হুমকি দিয়ে বন্ধ করে রেখেছে।

লাচি রাগী এবং একইসঙ্গে কাজেও অষ্টরম্ভা। তবু মঙ্গল তাকে ভালোবাসে। তাদের পরিবারেরও কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু শেরু পরিকল্পনা করতে থাকে মঙ্গলকে হত্যা করার। পাশাপাশি লাচির মায়ের কাছে লাচিকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিয়ে আসে। আগামী ছোটসর্দার তাঁর জামাতা হবে, সমাজে স্থান বাড়বে, ধনদৌলত হবে, এই সব বিবেচনা করা লাচির মাও লোভপরবশ লাচিকে শেরুর স্ত্রী করবেন বলে ঠিক করেন এবং মঙ্গলের সঙ্গে লাচির প্রেম ধ্বংস করবেন বলে লাচিকে গৃহবন্দি করে রাখেন। লাচির বাবা এইসব জেনে লাচির মা কে সত্য দর্শন করান। তাঁকে তিরস্কার করেন লোভের জন্য। জানিয়ে রাখেন এই পদক্ষেপের জন্যে লাচির মা-কে গৃহচ্যুত হতে হবে। জানিয়ে রাখেন নিজের জীবনসঙ্গী নির্বাচনের পূর্ণ অধিকার লাচির আছে। সেই ঠিক করবে মঙ্গল না শেরু, কে হবে তার জীবনসঙ্গী।

ইতোমধ্যে কাবিলার ছোটসর্দার নির্বাচনের বিষয় উপস্থিত হয়। কেউ শেরুকে ছোটসর্দার হিসেবে চায় না। শেষ পর্যন্ত মঙ্গল সম্মতি দিতেই সকলে শেরুকে

ছোটসর্দার করার প্রস্তাবে সম্মত হয়। কিন্তু তাতেও মঙ্গলের প্রতি বিদ্বেষ যায় না শেরুর। সে এটাকে অপমান হিসেবেই নেয়। সে চেষ্টা করতে থাকে তার পদাধিকার প্রয়োগ করে মঙ্গলকে ধ্বংস করতে। একমাত্র তা হলেই সে লাচিকে দখল করতে পারবে বলে মনে করে। দলবল পাঠায় মঙ্গলকে হত্যা করার জন্যে। আর একটা দিন সাপের দংশনহীনভাবে পার করলেই মঙ্গল সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত হত। কিন্তু লড়াই করতে করতে মঙ্গলের হাতের কবচ খুলে পড়ে। সেই মুহূর্তেই কালনাগিনী তাকে দংশন করে। সেটা ছিল পূর্ণিমা। সেই দিন থেকেই মঙ্গলের মধ্যে পরিবর্তন আসতে শুরু করে।

এর পর থেকেই কাহিনির ধারা পরিবর্তিত হতে শুরু করে। সেই রাত থেকেই মঙ্গল শুনতে শুরু করে এক মানবীর গান। সে সম্মোহিত হতে শুরু করে। জানতে পারে সেই নারী চন্দ্রা (ছবিতে রোজিনা)। সে ঘুমিয়ে পড়ে সেখানে। পরের দিন সে সব ভুলে যায়। ইতোমধ্যে পারিবারিক ভাবে তার আর লাচির বিবাহের কথা চলতে থাকে। ঠিক হয় একটি পূর্ণিমা বাদে মাঘী পূর্ণিমায় চার হাত এক হবে। কিন্তু পরবর্তী পূর্ণিমাতেই মঙ্গল আবার শুনতে পায় উত্তর পাহাড় থেকে সেই চন্দ্রার সম্মোহনী আহ্বান। পথভ্রষ্ট হয় সে। চন্দ্রার কাছে। চন্দ্রা আসলে নাগিনী যে কিনা নাগরাজার বরে মানবী রূপও ধরতে পারে। সে মঙ্গলের মধ্যে পেয়েছে নিজের প্রাণনাথ। ক্রমপরিবর্তমান মঙ্গলের মনে হয় কাউকে পেঁচিয়ে দংশন করতে। চন্দ্রা আর মঙ্গলের উত্তর পাহাড়ে মিলিত হওয়ার খবর পৌঁছায় শেরুর কাছে। সে লাচিকে নিয়ে উত্তর পাহাড়ে পৌঁছায়। কিন্তু কিছু প্রমাণ করতে পারে না। কিন্তু মঙ্গলের মধ্যে পরিবর্তন বাড়তেই থাকে। লাচির বীণ বাজানো সহ্য করতে পারে না মঙ্গল। সে পূর্ণিমা আসলেই সম্মোহিত হয়ে চন্দ্রার কাছে চলে যায়। লাচি তাকে অনুসরণ করে। সম্মোহিত মঙ্গল লাচিকেও চিনতে পারে না। তার মধ্যে সাপের গুণাবলী স্পষ্ট হতে থাকে ভবিষ্যতবাণী অনুসারে। তার দংশনে গাছ কালো হয়ে যায়। মঙ্গলের সম্পূর্ণরূপে সাপে পরিণত হওয়ার অপেক্ষা করতে থাকে চন্দ্রা। লাচিও ভুল বোঝে মঙ্গলকে।

মঙ্গলের কামড়ে শেরুর এক গুণ্ডা মারা যেতেই সে চলে যেতে চায় গভীর জঙ্গলে। যে মানুষদের সে ভালোবাসে, তার কারণে তাদের কোনো অমঙ্গল হোক, তা চায় না মঙ্গল। মঙ্গল যে তার সঙ্গে প্রতারণা করেনি, একথা জানার পর জঙ্গলে নির্বাসনে যেতে ইচ্ছুক মঙ্গলকে আটকায় লাচি। তারা যায় সেই সাধুবাবার কাছে। সেখানে জানতে পারে সম্পূর্ণ সাপ হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পেতে মঙ্গলকে গভীর

পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। তাকে নাগপুরীতে যেতে হবে নাগরাজার বর আনতে পুর্ণিমার আগেই। না হলে সে পরিণত হবে মহা শক্তিধর নাগে। এ ব্যতীত আর কোনো উপায় নেই। সেকথা শুনে মঙ্গল নির্গত হয় নাগপুরীর উদ্দেশ্যে। আর মঙ্গলের সাধনার অঙ্গ হিসেবে নাগ-নাগিনীকে দুধ খাওয়ানোর ভার নেয় লাচি।

শেরু পৌঁছায় জটাধর শয়তান তান্ত্রিকের কাছে, যে নারী উপহার পেলেই শেরুর হয়ে কাজ করে। সেখান থেকেই শেরু জানতে পারে মঙ্গল নাগরাজার বর পেলে মঙ্গলের কপালে ফুটে উঠবে নাগমণির চিহ্ন। সে শুধু কাবিলার সর্দার হবে না, হবে নাগপুরীর রাজা। লাচি ও রাজত্ব একসঙ্গে চলে যাবে ভেবে শেরু আরও শঙ্কিত হয়ে ওঠে। জটাধারী শুরু করে তার তান্ত্রিক কাজ। সে বেজি প্রেরণ করে। শুরু হয় অর্ধমানব অর্ধসাপ মঙ্গলের সঙ্গে বেজির লড়াই। বেজি পরাজিত হয়ে রণে ভঙ্গ দিলেও মঙ্গল গুরুতর আহত হয়। সেই স্থানে চন্দ্রা এসে পৌঁছায়। সে আহত মঙ্গলের সেবা করে। মঙ্গল জানায় সে কী কারণে সে নাগপুরীতে যেতে চায়। জানায় তার জীবনে লাচিই সব। আর কোনো নারী সেই স্থান নিতে পারে না।

শেরুকে জটাধারী তান্ত্রিক জানায় কেউ নাগ-নাগিনীকে দুধ খাওয়াচ্ছে। সেটা বন্ধ না করতে পারলে তার তন্ত্রমন্ত্র কাজ করবে না। শেরু চেষ্টা করে, কিন্তু লাচির হৃদয়ের আহ্বান অগ্রাহ্য করতে পারে না নাগিনী-শঙ্খিনীরা। ওদিকে চন্দ্রামণি জানায় মঙ্গলের দরকার নেই নাজরাজার বর নিয়ে। সে কালনাগে পরিণত হলে সে পাবে অনেক নাগিনীর সেবা। কিন্তু মঙ্গল এই সব কিছুই চায় না, চায় কেবল বিষমুক্ত মানুষ হয়ে লাচির কাছে ফিরতে। চন্দ্রা একথা জানার পরে তাকে সাহায্য করতে চায় না। তবু মঙ্গল জানায় চন্দ্রা সাহায্য না করলেও সে তার পথ থেকে সরে আসবে না। একই সঙ্গে প্রেমান্ধ চন্দ্রাকে জানায় প্রেমের সার্থকতা পাওয়ায় নয়, ত্যাগে। সে লাচির জন্যে জীবন দিতে পারে। আহত মঙ্গল চন্দ্রার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পৌঁছে যায় নাগরাজার পুরীতে। সেখানে সে তার মনের বাসনা জানায়। কিন্তু মঙ্গল ক্রমে পরিণত হতে থাকে সাপে। খোলস ছাড়তে থাকে তার। সাপের দংশনেই সে জীবন দিতে চায়। সেই সময় ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত নাগকন্যা চন্দ্রা নাগপুরীতে নৃত্যের মাধ্যমে নাগরজার মন জয়ের চেষ্টা করতে থাকে। জটাধারী চেষ্টা চালাতে থাকে নাগরাজা যেন বর না দেন। শেষ পর্যন্ত চন্দ্রার জয় হয়। ধর্মের জয় হয়। নাজরাজার বরে মঙ্গল হয় বিষমুক্ত মানুষ। কিন্তু জীবন ফিরে পেয়ে মঙ্গল চন্দ্রাকে ধন্যবাদ দেওয়ার আগেই সে চিরকালের মতো সাপে পরিণত হয়। এটাই ছিল চন্দ্রার ভবিতব্য।

জটাধারী শয়তানি তন্ত্রে ব্যর্থ হলে কাবিলায় শেরু জোর করে লাচিকে বিবাহ করতে যায়। তার আগেই সে তার ন্যায়পরায়ণ দাদুকে হত্যা করে। যারা তাকে সর্দার মানতে অস্বীকার করে তাদেরও সে হত্যা করে। কিন্তু লাচিকে বিবাহ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই মঙ্গল কাবিলায় ফিরে আসে। শেরু তাকে সাপ বলে কাবিলার মানুষদের খেপিয়ে দিতে চায়। লাচিকে দংশন করে প্রমাণ করে নাগরাজার বরে সে বিষমুক্ত। কিন্তু সে খবর পৌঁছে যায় প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে দ্বাদশবর্ষ অপেক্ষায় থাকা কালনাগিনীর কাছে। সে মঙ্গলকে দংশন করতে যাত্রা করে। চন্দ্রা সে কথা অনুধাবন করে মঙ্গলকে বাঁচাতে কালনাগিনীর সঙ্গে লড়াই শুরু করে। একদিকে সাপে সাপে, অন্যদিকে শেরুর দলের সঙ্গে মঙ্গলসহ কাবিলাবাসীর লড়াই চলে। শেষ পর্যন্ত শেরু এবং কালনাগিনী উভয়েই পরাস্ত ও নিহত হয়। মিলনে সমাপ্ত হয় ছবিটি।

মনসামঙ্গলের অনেকগুলি বিষয় সরাসরি এই ছায়াছবিতে অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথমেই আমাদের নজরে আসে কালনাগিনী আর সাপুড়ের দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গটি। কালনাগিনীর প্রতিশোধস্পৃহা আমাদের মনসার কথা স্মরণ করায়। সে সাপুড়ের কন্যাকে হত্যা করেছে। পুত্রকেও হত্যা করতে চায়। নির্বংশ করতে চায় সাপুড়েকে চাঁদ সদাগরের মতোই। প্রতি মুহূর্তে সুযোগের সন্ধান করে। সাপুড়েও ঠিক করে সে কিছুতেই কালনাগিনীর কাছে হেরে যাবে না। কালনাগিনীর চেষ্টাকে ব্যর্থ করার যথা সম্ভব চেষ্টা চালিয়ে যায় সে। ছবিতে সাপুড়েকে সহায়তা করা সাধুর মধ্যে ধন্বন্তরি বা শঙ্কর গারুড়ীর ছায়া দেখি। চন্দ্রা আর লাচি যেন বেহুলার দুই ভাঙা রূপ। একজন গৃহে মঙ্গলের মঙ্গলকামনা করে চলে নাগিনী-শঙ্খিনীকে দুধ পান করিয়ে। অন্যজন দেবতার কাছে লাস্যনৃত্য করে মঙ্গলকে মানুষের প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা করে। বেহুলা মানে যে ত্যাগ ও সতীত্বের আদর্শ মনসামঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখি, লাচি আর চন্দ্রামণি দুই পথ ধরে সেই আদর্শেরই ঐতিহ্য বহন করেছে ছবিতে। নাগরাজাও যেন মনসামঙ্গলের স্বর্গীয় দেবতাদের প্রত্নপ্রতিমা। তিনি নারীর লাস্য নৃত্যে প্রভাবিত হয়ে বর দিতেও পারেন, আবার বর দেওয়া থেকে বিরতও থাকতে পারেন। অন্যদিকে চন্দ্রার উত্তর পাহাড় থেকে গান শুনে সম্মোহিত হয়ে ছুটে যাওয়া, জাগতিক সংসারের সব কিছু ভুলে যাওয়া কোথাও আমাদের সম্মোহিত চাঁদ সদাগরের মহাজ্ঞান হারানোর স্মৃতি জাগরূক করে তোলে। মনসামঙ্গলের আদি কাঠামোর মধ্যে একালের প্রযুক্তিকে আশ্রয় করে এভাবেই কাহিনি পুনর্নির্মিত হয়েছে। কিন্তু ভাঙনটা ঘটেছে অন্যত্র।

প্রথমত, আমাদের পঠিত মনসামঙ্গল কাব্য মনসার বিজয়ের কাহিনি। সে কারণে কোনো মনসামঙ্গলের পুথি 'মনসাবিজয়' নামেও প্রচারিত হয়েছে। মনসা খল হতে পারেন, প্রতিশোধ পরায়ণা হতে পারেন, লক্ষ্যবস্তুর অকারণ ক্ষতিসাধনে তাঁর নিয়ত আগ্রহ থাকতে পারে, শত্রুপক্ষকে হৃদয়হীন আঘাত করার জন্যে সঠিক সময়ের অপেক্ষা করে নিজের ক্রূরতা প্রদর্শন করতে পারেন। কিন্তু সমস্ত মনসামঙ্গলের শেষে তাঁরই জয় ঘোষিত হওয়াটাই নিয়ম। মঙ্গলকবিরা এর বাইরে কিছু ভাবতে পারেননি। সে রকম কোনো ব্যতিক্রমী ভাবনার স্বাধীনতাও তাঁদের ছিল না। কিন্তু একটা স্রষ্টার সংকট সম্ভবত তাঁদের মধ্যে ছিলই। একটা হতাশা। সে কারণেই মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে একটু সতর্ক দৃষ্টি দিলে দেখি কবিগন কোথাও কোথাও মনসাকে দিয়ে কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়েছেন। যেমন আমরা যদি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের কথা ধরি, সেখানে কী দেখি আমরা! দেখি বেহুলার কাছে চাঁদ সদাগরের মনসা পুজোর নিশ্চয়তা পেয়ে মনসা চাঁদ সদাগরের সাত পুত্র, সপ্তডিঙা মধুকর ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু চাঁদ সদাগরের হাতে নাকাল হওয়ার ওখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করলেন না কবি :

চাঁদবেনে বলে আমি তবে পূজি তায়।
শুষ্ক ডাঙ্গায় চৌদ্দ ডিঙ্গা ঘরে যদি যায়।।[৫]

মনসার নাগবাহিনী দিয়ে শুষ্ক ডাঙার উপর দিয়ে বমাল নৌকা টানিয়ে নিয়ে তাদের নাভিশ্বাস বের করেই ছাড়লেন না সদাগর। তারও পরে পুজো নিয়ে বহু টালবাহানা করে শেষ পর্যন্ত একটা শ্রদ্ধাহীন পুজো সেরে মনসার সঙ্গে মিতালী করলেন। আসলে বিষমুখী দেবীকে পরাস্ত দেখাবার শক্তি মঙ্গলকবিদের ছিল না। বিশেষত যেখানে তাঁরা সেই দেবীরই জয় গাইতে বসেছেন। কিন্তু দেবীর খল স্বভাবে তাঁদের খুব একটা সম্মতিও ছিল না। তাই দেবীকেও সহজে কিছু পেতে দেননি। শুধু ক্ষেমানন্দ নন, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাসের মতো সকল কবিই এই মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। এখানে দেখলাম ক্ষতিকর কালনাগিনীকে কাহিনিকার হত্যা করলেন। যেন সেকালের প্রতিশোধ একালে নিয়ে মহাকালের উপভোক্তা হৃদয়কে একটা ন্যায় বিচারের স্বাদ দিলেন। একে ভাঙন বলব না আমরা!

দ্বিতীয়ত, মনসামঙ্গলের লখিন্দরকে যদি আমরা দেখি, তবে এই ছবির লখিন্দর মঙ্গল। শৈশব থেকেই তার মাথার উপর কালনাগিনীর ফণা দোদুল্যমান। শুধু একটা সুযোগের অপেক্ষা। তিলার্ধ সময় লাগবে না কালনাগিনীর তাকে হত্য করতে। সাপুড়ে

ক্রমাগত চেষ্টা করে গেছে কালনাগিনীর থেকে সন্তানকে রক্ষা করতে। সাপুড়ের ছেলে হলেও একদিনের জন্যেও সে চেষ্টা করেনি সন্তানকে সাপ বশীকরণের মন্ত্রদীক্ষা দিতে। লখিন্দরের যেমন ভাগ্যলিখন ছিল বাসরঘরে তাকে দংশন করবে কালনাগিনী, মঙ্গলেরও সম্ভবত ছিল দ্বাদশবর্ষ প্রতীক্ষার আগেই তার কবচ খসে পড়বে এবং তাকে কালনাগিনী দংশন করবে। সেটাই হয়েছে। চাঁদ সদাগরের লোহার বাসরঘর নির্মাণের সমস্ত চেষ্টা যেমন ব্যর্থ হয়েছিল, ছবিতেও সাপুড়ের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু চাঁদ সদাগরের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরে লখিন্দরকে যেমন মৃত্যুবরণ করতে দেখি, মঙ্গল সেই ভাগ্যবিপর্জয় মেনে নিতে পারে না। সে বিধানের উল্টোপিঠে হেঁটে নিজের কাঙ্ক্ষিত মানব জীবন নিজেই ছিনিয়ে আনতে নাগপুরীর দিকে যাত্রা করেছে। বিধানের হাতে নিজের জীবনের বিচার ছেড়ে না দিয়ে ছবির লখিন্দরের যে মৃত্যুত্তীর্ণ অভিযান, তা তো মনসামঙ্গলের বিকল্প পাঠ!

তৃতীয়ত মনসামঙ্গলে দেখি বেহুলা ভেলায় ভেসে লখিন্দরকে নিয়ে স্বর্গপুরীতে যাওয়ার সময় নানা প্রলোভন এসেছে তার পথে। গোদা তাকে বিবাহ করতে চেয়েছে। দানী তাকে বিবাহ করতে চেয়েছে। বৈদ্য তাকে বিবাহ করতে চেয়েছে। স্বামীর পচা-গলা মৃতদেহ নিয়ে ভেসে যাওয়ার থেকে, বিধবার মতো গুরুত্বহীন জীবনের থেকে আর একটা সুখের জীবন যাপনের স্বপ্ন দেখিয়েছে তারা প্রত্যেকে বেহুলাকে। কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই বেহুলা সেই সব স্বপ্ন দেখতে অস্বীকার করেছে। বেছে নিয়েছে কেবল তার বর্তমান জীবন, যেখানে সে আর লখিন্দর ছাড়া আর কেউ নেই, কিছু নেই। একই প্রলোভন এসেছে মঙ্গলের কাছেও। কালনাগ হয়ে গেলে সে ভুলে যাবে মানবজীবনের সমস্ত কথা। ভুলে যাবে লাচিকে। দিন রাত পাবে নাগিনীদের সেবা। পাবে চন্দ্রার প্রেম। সব নাগিনী প্রতীক্ষা করে থাকবে কালনাগের কৃপা দৃষ্টির। কিন্তু এই সব প্রলোভন জয় করেছে মঙ্গল। তার কাছে কালনাগ হয়ে ভোগের শীর্ষে থাকার থেকে সাধারণ মানুষ হয়ে লাচির প্রেমে সিক্ত হয়ে থাকা অনেক শ্রেয়। মনসামঙ্গলের নারীর একগামিতা, সতীত্ব, প্রেমের প্রতি নিষ্ঠা, এই সব কিছু একজন কেন্দ্রীয় পুরুষের উপর আরোপিত হয়েছে। বুঝতে পারি আধুনিক লিঙ্গনিরপেক্ষতা এই ছবির মঙ্গলের মধ্যেই মুক্তি দিয়েছে বেহুলার প্রেমকে।

চতুর্থত, এই ছবির ক্ষেত্রেও আমাদের বলতে হয় 'নাগিন' ছবির মতোই ধর্মের রাজনৈতিক দিকটি আক্রান্ত হয়েছে। মনসামঙ্গলে হাসান-হোসেন পালার মতো অংশে হাস্যরস সৃজনের নামে মঙ্গলকবিরা নিজেদের রাজনৈতিক হিন্দুত্বের দিকটি প্রকট

করেছিলেন। সেখানে মুসলিম শাসনের সমকালে নির্যাতিত হিন্দুসমাজের বুকে বল সঞ্চার করতে গিয়ে হিন্দু দেবীর হাতে মুসলিম শাসকের নাকাল দশা দেখিয়েই থামেননি তাঁরা। মুসলমান শাসককে দিয়ে মনসা পুজোর মতো ঘটনাও ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা চলচ্চিত্রের আলোচনায় প্রথমেই বলেছি সেখানে ধর্মের সামাজিক দিকের কাছে রাজনৈতিক দিকটি আক্রান্ত হয়েছে। এই ছবিও তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের মতো মুসলিম রাষ্ট্রে স্বাধীনতার পরে নির্মিত এই ছবিতে কলাকুশলীদের বেশিরভাগের ধর্মীয় পরিচিতি মুসলমান হলেও ছবিতে তারা কেউ মঙ্গল, কেউ বা শেরু। এখানে সাপুড়ের থাকার স্থান 'কাবিলা'। বাঙালি 'পাড়া' নয়, উর্দু 'কাবিলা'। সেখানে জটাধারী তান্ত্রিকও থাকেন, থাকেন ওস্তাদ বাবাও। ফকির দরবেশের মতো এই মানুষটি আবার নাগসাধক। জটাধারী পৌত্তলিক। তিনিও নাগসাধক। হিন্দু আর ইসলাম ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক সীমানাগুলো সব নড়েচড়ে যায় ছবিতে। মনসামঙ্গল কাব্যের বিনির্মাণের এই মাত্রাগুলো আমাদের কাছে এই ছায়াছবির সৌজন্যে প্রকট হয়ে ওঠে। মনসামঙ্গলের হতে পারত এমন অনেক ভাষা মুখর হয়েছে ছবিতে। সম্ভবত সেকারণেই বাংলা চলচ্চিত্র মনসার লিগ্যাসিকে পরিত্যাগ করতে চায়নি।

বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা দেখিয়েছি বাংলা মনসামঙ্গল কাব্যের যে প্রতিষ্ঠিত কাহিনি, তা কেমন দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে বাংলা চলচ্চিত্রে এসে। কালনাগিনীর সমস্ত আয়োজন, প্রতীক্ষা শুধু ব্যর্থ হল তাই নয়, তাকে মরতেও হল। অপরদিকে লখিন্দর আপন শর্তে জীবন লাভ করল। আসলে আমরা যখন মনসামঙ্গল কাব্য পাঠ করেছি, সেই পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক থেকে যে বাঙালিরা মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন, শ্রবণ করেছেন, উপভোগ করেছেন, আমরা কেউ কি চেয়েছি কালনাগিনী জিতে যাক আর পরাজিত হোক লখিন্দরের তাজা জীবন? চাইনি কেউ। অথচ মনসাকথার প্রচলিত রীতি আর সাপের ভয় শাসন করেছে আমাদের চাহিদাকে। অ্যান্টিভেনম সিরামের যুগে সেই ভয় থেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন চলচ্চিত্র নির্মাতারা। আমাদের যুগ যুগ ধরে চাওয়ার প্রতি সৎ থেকে তাঁরা বিনির্মাণ ঘটিয়েছেন প্রচলিত মনসাকথার। আমদের একালের বিজ্ঞান জানিয়ে দিয়েছে কালনাগিনী নামে যে সাপকে নির্দিষ্ট করা হয়, তা আসলে বিষধর নয়। চলচ্চিত্রেও যে সাপটিকে কালনাগিনী বলে দেখানো হয় তা আসলে একটি গোখুরা সাপ। তার অবশ্য বিষ থাকার কথা। ভাইপার গোত্রের সাপ গোখুরা। কিন্তু

তার মধ্যে কালনাগিনীকে প্রতিষ্ঠা করে একালের চলচ্চিত্র নির্মাতারা যেন সেকালের অন্যায়ের প্রতিবিধান করেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মনসামঙ্গল কাব্যের বিদ্বেষ : চলচ্চিত্রে বিশ্বস্ত বিশ্বাস

আমরা এর পরে সাদাকালো ছবির সীমা পার করে কিছুটা সাম্প্রতিক ছবিতে দৃষ্টিপাত করতে চাই। আরও ভালো ভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার, আরও জটিল চিত্রনাট্য সম্বলিত বাংলা ছবি। সেক্ষেত্রে আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে ১৯৯৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এপার বাংলার ছবি 'নাগপঞ্চমী'[৬]। পশ্চিমবঙ্গের বাংলা চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় জুটিগুলির অন্যতম প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণার এটিই ছিল একত্রে প্রথম আত্মপ্রকাশের ছবি। গানগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। ছবিটির কাহিনি ও সংলাপ রচনা করেছিলেন প্রখ্যাত বাংলা গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন প্রফুল্ল কর। সাই প্রকাশ নির্দেশিত এই ছবিতে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ছাড়াও দেবশ্রী রায়, উত্তম মোহান্তি, বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, নির্মল কুমারের মতো বাংলা ছবির সপ্রতিষ্ঠ কলাকুশলীরা রয়েছেন। ছবিটির প্রযোজক এল.ভি. প্রসাদ।

ছবির কাহিনি শুরু হয়েছে জানকীর (ছবিতে দেবশ্রী রায়) নাগেশ্বরী পূজার মধ্য দিয়ে। আপাদমস্তক সতীলক্ষ্মী বলতে যা বোঝায়, তেমনি পবিত্র অত্মপ্রকাশ জানকীর। সে বিস্মিত হয় তার বিবাহ পরবর্তীকালে যখন থেকে সে স্বামীর ঘরে পদার্পণ করেছে, তখন থেকেই সে বাড়িতে একটি কিশোর হাতি, যার নাম ছবিতে গনেশ, সে একটি গণ্ডীর মধ্যেই থাকে আর কাঁদে। কিছুতেই হাতিটি গণ্ডীর বাইরে আসে না। এই রহস্য কিছুতেই জানকী উদ্ধার করতে পারে না। দিনটা নাগপঞ্চমী তিথি এবং তাদের বিবাহবার্ষিকী। স্বামী দিনেশ চৌধুরীর (ছবিতে উত্তম মোহান্তি) কাছ থেকে নেকলেস উপহার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি পার্সেলে বিধবার থানও উপহার পায়, যেখানে একটা সাপের ছবি দেখা যায়। তার স্বামী ও সে একই সঙ্গে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে প্রেরক সম্বন্ধে। ছবিটিতে বর্তমান আর অতীতকালের মধ্যে কাহিনি পেন্ডুলামের মতো যাতায়াত করেছে।

ছবিতে সনাতন চৌধুরীর দুই সন্তান। ছেলে দিনেশ সব সময় মদ-জুয়া নিয়ে ব্যস্ত। সে খল নয়, শুধু বিপথগামী। অন্যদিকে মেয়ে অম্বিকা (ছবিতে ঋতুপর্ণা) সোনার

টুকরো মেয়ে বলতে যা বোঝায়, ঠিক সেইরকম। ছেলের হাতে বিষয়-সম্পত্তি ছাড়লে সব শেষ হয়ে যাবে বিবেচনা করে সনাতন চৌধুরী এমন একজনকে জামাতা ঠিক করতে চান, যে তাঁর তিল তিল করে গড়ে তোলা সাম্রাজ্য রক্ষা করতে সক্ষম হবে। সে কারণেই তিনি অম্বিকার জন্যে রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তথা রাজাকে (ছবিতে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়) বিবাহের জন্যে পাত্র হিসেবে নির্বাচন করেন। বিবাহের পরে রাজা আর অম্বিকার কোলে একটি ছোট্ট মেয়ে আসে। নাম পূজা। অন্যদিকে জুয়ার আসরেই দিনেশ চৌধুরী রাহুল, মনু ও পটলা (বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়) নামের তিন শয়তানের পাল্লায় পড়ে। এই তিনজন জুয়া, খুন, রাহাজানি, চোরাচালান, মিথ্যে সাক্ষী সহ সমস্ত রকমের দুষ্কর্ম করতে সিদ্ধহস্ত। তারা জুয়ার আসরে দিনেশকে টাকা ধার দিয়ে কব্জা করে ফেলে। তারা পরিকল্পনা করে সনাতন চৌধুরী মারা গেলে যখন দিনেশ চৌধুরী সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে, তখন তারা সেই সমস্ত সম্পত্তি দিনেশকে ঠকিয়ে নয় তো ভয় দেখিয়ে হরণ করবে।

তাদের পরিকল্পনায় জল ঢেলে মরণাপন্ন সনাতন চৌধুরী উইল প্রস্তুত করে যান, যেখানে সমস্ত সম্পত্তি তিনি মেয়ে অম্বিকার নামে করে দেন, এবং সেই সম্পত্তি রক্ষাকর্তা হিসেবে জামাতা রাজেন্দ্রকে নির্দিষ্ট করেন। অপর পক্ষে ছেলে দিনেশের জন্য কেবল মাসিক পাঁচ হাজার টাকা মাসোহারার ব্যবস্থা করে যান। এই ভাগ বাঁটোয়ারা দিনেশ মেনে নিতে পারে না। সে গিয়ে জোটে ওই তিন শয়তানের আসরে। নিজেদের পরিকল্পনা মতো কাহিনি এগোয়নি জানতে পেরে রাহুল, মনু, পটলা হুমকি দেয় তাদের টাকা ফেরত না দিলে তারা দিনেশকে মেরে ফেলবে। কিন্তু তাতে টাকা হাতানোর সম্ভাবনা চিরতরে জলাঞ্জলি যাবে বিবেচনা করে তারা সনাতন চৌধুরীর সম্পত্তির ওয়ারিশ অম্বিকাকেই মেরে ফেলার পরিকল্পনা করে।

ব্যবসার কাজে রাজা বাইরে গেলে সে সুযোগ উপস্থিত হয়। তিন শয়তান নানা প্রচেষ্টা চালাতে থাকে অম্বিকাকে মেরে ফেলার। সাপ দিয়ে মারার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে তারা অম্বিকাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে মারতে চায়। কিন্তু কিশোর হাতিটি অম্বিকার বিপদ অনুধাবন করে বাধা দিতে চায়। সে কথা না বুঝে সরলমতী অম্বিকা তাকে একটি গণ্ডী দিয়ে এবং দিব্যি দিয়ে আবদ্ধ করে দিয়ে যায়। হাতিটির ইঙ্গিত, কান্না সব ব্যর্থ হয়। অম্বিকা সরল মনে দাদাকে বিশ্বাস করে বিপদের মুখে চলে যায়। জঙ্গলের মধ্যে তিন শয়তানের হাতে খুন হয়ে যায় অম্বিকা। তারা সেখানেই অম্বিকার মৃতদেহটি কবর দিয়ে দেয়। তার উপরে একটি উইঢিবি চাপিয়ে সেখানে নাগদেবীর মূর্তি বসিয়ে দেয়,

যাতে কেউ সন্দেহ না করে যে, তার তলায় একটা লাস পোঁতা আছে। কেবল একটি বাঁদরের সৌজন্যে অম্বিকার সন্তানটি রক্ষা পায়। ছবিতে বাঁদরটির একটি নামও আছে, রামু। সন্তানটি বড় হতে থাকে নাগদেবীর আশীর্বাদে আর নাগেশ্বরী দেবীর পুরোহিতের ঘরে। পুরোহিতের কন্যা শান্তি তাকে মাতৃস্নেহ দিয়ে বড় করতে থাকে। পূজার নাম সেখানে মণিমালা।

কাহিনির পটপরিবর্তনে দেখি রাজা ফিরে আসে বাড়িতে। খুঁজতে থাকে অম্বিকাকে। সে কেন অম্বিকার মৃত্যুর খবর পেল না তার উত্তর অবশ্য ছবিতে নেই। সে জানতে পারে অম্বিকা মৃত। তার পরেই রাজা মানসিক ভারসাম্য হারায়। মণি এক নাগপঞ্চমীতে চৌধুরী বাড়িতে এসে পৌঁছায়। এসেই সব উলট-পালট করে দিতে থাকে। দিনেশ চৌধুরী আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সে বাড়ির সব কিছু জানে দেখে। তার আবির্ভাবেই বুঝতে পারি সে ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারিনী। ছবির প্রথমে আমরা দেখেছিলাম দিনেশের কাছে পার্সেলে স্ত্রীর জন্যে সাদা থান আর সাপের ছবি এসেছিল। শয়তানত্রয়ীর কাছেও নানা মাধ্যমে সাপের সংকেত এসে পৌঁছেছিল, যা তাদেরকে বেশ শঙ্কায় ফেলে দেয়। তারাও ভাবছিল কে এই সংকেত পাঠাচ্ছে বা যে পাঠাচ্ছে সে কী বলতে চাইছে! এখন আমরা বুঝতে পারি সে সংকেত পাঠাচ্ছিল মণিই। সে চায় তার মাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে। চায় মায়ের শোকে পাথর হয়ে যাওয়া বাবাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে। তার ডাকেই এতকাল পরে হাতিটি, যার নাম গনেশ, সে গণ্ডীর বাইরে বেরিয়ে আসে।

নানা ভাবে মণি চেষ্টা করে তার পালয়িত্রী পুরোহিতকন্যা শান্তি আর তার বাবার মধ্যে একটা সুন্দর সম্পর্ক তৈরি করে বাবার মধ্যে তৈরি হওয়া শূন্যতাকে ঢেকে দিতে। মণিকে পছন্দ হয় জানকীর। তারই কারণে মণির স্থান হয় চৌধুরী বাড়িতে। অন্যদিকে মণিকে মেরে ফেলার চক্রান্ত করতে থাকে রাহুল, মনু আর পটলা। তারা এইবারে মণিকে খুনের ভার দেয় দিনেশকে। দিনেশের মধ্যে বরাবরের বিবেকের দংশন হয়। কিন্তু সে তখন খাঁচাবন্দি ইঁদুরের মতো। তাকেই সেটাই করতে হবে যেটা রাহুল চায়। ঠিক হয় আইসক্রিমের মধ্যে বিষ প্রয়োগ করে মেরে ফেলা হবে মণিকেও। কিন্তু গনেশের সৌজন্যে তাদের সে ইচ্ছা পূরণ হয় না। মণিকে ঘিরে থাকে গনেশ, রামু আর জানকীর স্নেহ।

অন্যদিকে জঙ্গলের মধ্যে শান্তি গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হলে রাজা তার সম্মান রক্ষা করে। এই ভাবে রাজা আর শান্তি আরও কাছাকাছি আসে। পরে জানা যায় এই

সমস্ত পরিকল্পনা ছিল মণির। এর মাঝে কিছুটা ক্যাবলা ভূত, জগাই-মাধাই ধরণের কিছু কমিক রিলিফের ব্যবস্থা আছে ছবিতে, যার সঙ্গে মূল চিত্রনাট্যের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং তা চিত্রনাট্যকে দুর্বলই করেছে। রাহুলের তোলা ছবিতে চারজনে দেখে ছবিতে মণি একটা সাপ। কিন্তু জানকী দেখে মণিকেই। চূড়ান্ত বিভ্রান্ত দিনেশকে ভবিতব্য শুনিয়ে যায় মণি। একই সঙ্গে তার সৌজন্যে রাজা আর শান্তির সম্পর্ক একটা পারস্পরিক স্বীকৃতির জায়গায় এসে পৌঁছে যায়। পাশাপাশি জানকীও তার সুদীর্ঘ সাত বছরের বন্ধ্যাত্ব কাটিয়ে সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ে। অর্থাৎ ভালোর সঙ্গে ভালো আর খারাপের সঙ্গে খারাপ ঘটতে থাকে। মণির ব্যবস্থাতেই রাজা আর শান্তির বিবাহ হয়ে যায়। অন্যদিকে দিনেশ চৌধুরীসহ চারজন চালাতে থাকে মণিকে মেরে ফেলার চক্রান্ত।

মাঠের মাঝে সাপ রূপিনী মণিকে টেনে এনে বোমার আঘাতে মেরে ফেলার চক্রান্ত করে মনু। মণিকে রক্ষা করে গনেশ আর রামু। মনুর লাগানো বোমায় মনুরই মৃত্যু হয়। একজন মাতৃঘাতীর সাজাবিধান করতে পারে মণি। রাহুল পরিকল্পনা করে রাজাকে দিয়েই সমস্ত সম্পত্তি লিখিয়ে নেবে। আসন্ন সম্ভবা জানকীকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে দলবল নিয়ে। এবারেও আসরে অবতীর্ণ হয় গনেশ ও রামু। জানকী সন্তানের জন্ম দেয় সেখানেই। এর পরেই মণি রাহুলকে সেই স্থানে তাড়া করে নিয়ে আসে যেখানে তারা অম্বিকাকে মেরেছিল। সেখানেই রাহুলকে দংশন করে মণি। শেষ হয় তার প্রতিশোধ গ্রহণের আরও একটা পর্ব।

পটলা বোমের সাহায্যে মণিকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু নিয়তি সে চেষ্টা ব্যর্থ করে তাকেই মৃত্যুর মুখে পৌঁছে দেয়। মণির কেবল একটি লক্ষ্য বাকি থাকে। দিনেশ চৌধুরী। দিনেশ চৌধুরী মণির হাত থেকে বাঁচার জন্যে গিয়ে হাজির হয় এক তান্ত্রিক কাপালিক বাবার কাছে। কাপালিক মণিকে বন্দি করতে চায়। তার মাধ্যমে সে দৈব শক্তির অধিকারী হবে। সেই উদ্দেশ্যে তান্ত্রিক মণিকে আহ্বান করে যজ্ঞ শুরু করে। তান্ত্রিকের পাতা ফাঁদে ধরা দিতে বাধ্য হয় মণি। চিরকালের মতো মণিকে সাপ করে দিতে চায় কাপালিক। সেই মতো তার তান্ত্রিক আচার চালাতে থাকে মণির উপর।

দিনেশ চৌধুরী ভেবেছিল সে এতে শান্তি পাবে। কিন্তু দিনেশের বিবেক তাকে সেই শান্তি দেয় না। বিবেকের অমোঘ ডাকে সারা দিয়ে দিনেশ চৌধুরী পৌঁছায় কাপালিকের আস্তানায়। মণিকে রাজার সঙ্গে একত্র হয়ে লড়াই করে কাপালিকের

থেকে উদ্ধার করে। কিন্তু মণি তার শেষ প্রতিশোধও পূরণ করে দিনেশ চৌধুরীকে দংশন করার মাধ্যমে। এর পরেই সকলে নাগেশ্বরী মন্দিরে প্রার্থনা করে দিনেশের জীবন ফিরিয়ে আনতে। নাগেশ্বরীর কৃপায় মণি শান্ত হয়। সে দিনেশের শরীর থেকে বিষ শোষণ করে তাকে বাঁচিয়ে তোলে। বেঁচে ওঠা দিনেশের প্রার্থনায় নাগেশ্বরীর আশীর্বাদে মণিও ফিরে পায় মানুষের জীবন। রাজা জানতে পারে এই মণিই তার হারিয়ে যাওয়া মেয়ে পূজা। এখানেই কাহিনির শুভ সমাপ্তি।

আপাদমস্তক বাণিজ্যিক মেলোড্রামাটিক এই ছবিটিতেও অন্যান্য সাপের ছবির মতোই মনসামঙ্গলের লিগ্যাসি বাহিত হতে দেখি। মনসার মতোই মণি প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে শত্রু বিনাশ করে চলে একের পর এক। কিন্তু সতর্ক দৃষ্টি দিলে এই ছবিতে বেশ কিছু জায়গায় মনসামঙ্গলের কাঠামো ভাঙার চেষ্টা চোখে পড়ে।

মনসামঙ্গল কাব্য পাঠ করলে আমরা বিভিন্ন কবির হাতে মনসা চরিত্রকে নানা ভাবে অঙ্কিত হতে দেখি। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল যখন পাঠ করি, তখন বারবার মনসার ভাগ্যবিড়ম্বনা আমাদের চোখে পড়ে। মনসা তাঁর জন্ম থেকেই ভাগ্যবিড়ম্বিতা। মাতৃ পরিচিতি নেই। পিতৃপরিচয় সমাজে প্রথমে স্বীকৃতি পায়নি। পিতার সঙ্গে প্রথম দেখা হলে সুন্দরী যুবতী হিসেবে পিতাই তাঁকে ভোগ করতে চেয়েছেন। কোনোক্রমে তাঁকে নিবৃত্ত করার পর তাঁর স্থান হয়েছে বচাইয়ের ঘরে। অবিবাহিত বচাই একে শিবের উপঢৌকন সিদ্ধান্ত করে মনসাকে ভোগ করতে চেয়েছেন। নিজেই নিজেকে সে যাত্রা রক্ষা করতে হয়েছে মনসার :

পদ্মা বলে হরি হরি অদৃষ্টের ফল।
বাপে আনি থুইল বচাই হইল বর।।
কি করিব কোথা যাব না দেখি নিস্তার।
আপনার বিক্রম বিনা না দেখি উদ্ধার।।[৭]

বচাই গৃহ থেকে শিব আপন ঘরে নিয়ে গেলে সেখানে মনসার কপালে জুটেছে আরও বড় বিপদ। একদিকে গঙ্গা, অন্যদিকে চণ্ডী, সতিনের সম্ভাবনায় কুকথা আর প্রহারে জর্জরিত করে তুলেছে মনসাকে :

আপদ নিকট হইলে বুদ্ধি যায় ছাড়ে।
গঙ্গা যত বলিল চণ্ডীর কোপ বাড়ে।।
কোপে ব্যাকুল দেবী বলে অহংকারে।
চুল ধরি মনসারে মারে আরবারে।।

চণ্ডীর প্রহারে দেবীর শরীর জর্জর।
সহিতে না পারে পদ্মা বলে খরতর।।[৮]

পিতৃগৃহ থেকে ঘটনাক্রমে বিতাড়িত হতে হয়েছে মনসাকে। অতঃপর এসেছে তাঁর বিবাহের যোগ। শিব জরৎকারু মুনির সঙ্গে ঠিক করেছেন মনসার বিবাহ। কিন্তু সেই বিবাহ সুখের হয়নি। রাত্রি পোহাতে না পোহাতে জরৎকারুর কুকথায় লেগে গেছে বিষম্বাদ। জরৎকারু কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছেন মনসা :

মুনি বলেন তুমি মোর করিলা ইচ্ছা ভঙ্গ।
হের আমি চলে যাই তোমা পরিহরি সঙ্গ।।
এতেক বলিয়া মুনি চলিল তখন।
সন্ধ্যা ভঙ্গ হয় মুনি বিস্মৃত হইল মন।।[৯]

স্বামী পরিত্যক্তা হয়ে পিতৃগৃহে স্থান হল আট নাগসন্তানের জননী মনসার। সেখানেও বেশিদিন থাকা সম্ভব হলনা সৎ মাতা চণ্ডীর তাড়নায়। অতঃপর পুনরায় বাস্তুচ্যুতি এবং বনবাস। পিতৃগৃহে স্থান নেই, স্বামীগৃহের স্বপ্ন নির্মাণের আগেই জলাঞ্জলি হয়ে গেছে, মর্ত্যে পূজা নেই, স্বর্গে প্রবেশাধিকার নেই, কোনো সম্মান নেই, নেতা ছাড়া কোনো বান্ধব নেই, আশ্রয় নেই। এই এত 'নেই'-এর মধ্যে একজন নারীর মানসিক অবস্থা কেমন হতে পারে, তা কি আমরা কল্পনা করতে পারি না! আমরা কি অনুমান করতে পারি না, নিঃসীম আঁধারে যাঁর অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত নিমজ্জিত বলে প্রতীত হচ্ছে, তাঁর মধ্যে যে কোনো সুস্থিতির বিরুদ্ধে অভিযোগ জন্মানো স্বাভাবিক!

শিবকন্যা মনসা। পিতা দেবাদিদেব। মাতা ভবতারিণী। রয়েছে বিষ অধিকার। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে অবাধ যাতায়াতের অবাধ ছাড়পত্র যাঁর জন্ম মুহূর্তেই করায়ত্ত হওয়া সম্ভব ছিল, সেই তাঁকেই এক স্থান থেকে আর এক স্থানে বেত্রাহত কুকুরের মতো কেবল বিতাড়িত হতে হচ্ছে। এই প্রতিবেশ একজন নারী কেন, একজন মানুষের পক্ষেও মেনে নেওয়া সম্ভব না। মনসাও মেনে নেননি। নিজের ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন। মনোবিকলন অন্তত তাঁর সেই জবরদস্তিকে স্বাভাবিক বলেই মেনে নেবে। ফলত জীবনই মনসাকে কল্যাণমূর্তি হিসেবে নিজের প্রতিষ্ঠার ততখানি সুযোগ দেয়নি, যতখানি প্রলয়ঙ্করী খরদেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। এখন এই জানা বিষয়গুলো আমরা 'নাগপঞ্চমী' ছবিটির মধ্যে মনসামঙ্গলের বিনির্মাণ আলোচনায় উত্থাপন করছি কেন? আসলে এই বিষয়গুলিই ছবিটির মধ্যে মনসামঙ্গলের সেই বিনির্মিত পাঠের ভিত্তি তৈরি করে।

মণি, যে আসলে পূজা, অর্থাৎ রাজা ও অম্বিকার একমাত্র সন্তান, আমাদের তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া জরুরি। সনাতন চৌধুরীর সম্পদের কমতি ছিল না। মৃত্যুর আগে উইলে সেই সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকার তিনি কন্যা অম্বিকাকে দিয়ে যান। সেই সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে তিনি জামাতা রাজাকে নিযুক্ত করে যান উইলেই। অর্থাৎ অম্বিকার অবর্তমানে রাজাই সেই সম্পদের মালিক। এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পরে উভয়ের অবর্তমানে তাদের কন্যা পূজার কাছে যেত সেই সম্পদের আইনসম্মত উত্তরাধিকার। সনাতন চৌধুরী ছেলের ক্ষেত্রে মাসিক পাঁচ হাজার মাসোহারার ব্যবস্থা করেই হাত ধুয়ে ফেলেছিলেন। সব দিক বিচার করলে পূজার শৈশব হয়ে উঠতে পারত মধুর। কোনো স্বাচ্ছন্দের অভাব তার হওয়ার কথা ছিল না। বাবা-মায়ের ভালোবাসা, সাহচর্য, সুখে থাকার নানা উপকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-দীক্ষা, সব কিছুই তার হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মামার দুষ্কর্ম আর লোভ তাকে এমন এক শৈশবের মধ্যে এনে ফেলেছে, যেখানে সবটুকু ছেয়ে আছে নাস্তিতে। মা খুন হয়ে গেছে। পিতা হারিয়েছে মানসিক ভারসাম্য। অন্যের গৃহে কৃপাপরবশ হয়ে বেড়ে ওঠা তার। অথচ যাদের সৌজন্যে তার এই জীবন, তারা আছে বহাল তবিয়তে। একটার পর একটা দুষ্কর্ম করেও তাদের জন্য বলবৎ হয় না কোনো শাস্তি। এগুলিই পূজা বা মণিকে ক্রোধে উন্মত্ত করে তোলে। নাগদেবীর বরে তার মধ্যে জন্মাবধি ছিল দৈবশক্তি। জন্মের সপ্তম বছরে এক নাগপঞ্চমীর দিন থেকে সে একের পর এক প্রতিশোধ নিতে থাকে। আমরা তার মধ্যে মনসার প্রত্নপ্রতিমাকে প্রকট হয়ে উঠতে দেখি।

পূজা তার অপরাধী মামাকে ঘরে থেকেই মেরে ফেলতে পারত। কিন্তু সে তা করেনি। বারং মামি জানকীর স্নেহের কাছে বারবার স্নেহের আঁচল খুঁজেছে। মনসামঙ্গলের মধ্যে মনসার সঙ্গে আমরা বারবার উৎপাদনশীলতার সংস্কৃতি বা ফার্টিলিটি কাল্টের সংযোগ খুঁজে পাই। মনসা জন্ম নিতেই মঙ্গলকবিরা উচ্চারণ করেন বসুধার প্রসন্নতা। ছবিটিতেও দেখি চৌধুরী বাড়িতে মণি বা পূজার আগমনের পরেই সপ্তবর্ষব্যপী বন্ধ্যাত্ব কাটিয়ে আসন্নপ্রসবা হয়ে উঠছে জানকী। দেখি গনেশ নামক হাতিটি গণ্ডী ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। রাজা একটু একটু করে সম্বিৎ ফিরে পাচ্ছে মণির প্রযত্নে। রাজার হতাশ জীবনে কিছু তাৎপর্য সঞ্চারিত করার জন্যে মণি নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পালিকা মাসি শান্তিকে বাবা রাজার কাছাকাছি আনার জন্যে নানামুখী পরিকল্পনা করে যাচ্ছে মণি। রাজাও ধীরে ধীরে জীবনের স্বাভাবিক

ছন্দে প্রত্যাবর্তন করছে মণির নির্মিত চিত্রনাট্যে। কন্যাদায়গ্রস্ত পালক পুরোহিতের ভার লাঘবও মণির সৌজন্যে সম্ভব হয়েছে।

মণির বয়স মাত্র মাত্র সাত বছর। কিন্তু তার কথাবার্তাসহ কাজকর্ম অনেক পরিণত। এসব নিয়ে আমাদের মধ্যে সন্দেহের জগরণ হয় না, কারণ আমরা বুঝতে পারি মণি একটি বিশেষ দৈবী উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই বয়ঃপ্রাপ্তা হয়েছে। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যের মধ্যে যতটা প্রতিশোধ থাকার কথা, মণির কল্যাণকামী কর্মধারায় সেই খররূপ বারবার প্রতিহত হয়েছে। মনসার অপ্রাপ্তির মাঝে জন্ম নেওয়া প্রলয় মণির মধ্যেও আছে। কিন্তু মনসামঙ্গলের মনসার মধ্যে অনুপস্থিত কল্যাণময়ী রূপ মণিকে পৃথক করে চিনিয়ে দিয়েছে বারবার।

মামা দিনেশকে সাজা দেওয়ার থেকে মণির অনেক বেশি দ্রুততা দেখি তিন দুষ্কৃতি রাহুল-মনু-পটলাকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে। কারোর ক্ষেত্রেই মণিকে হঠাৎ আঘাতে বিপর্যস্ত করতে দেখি না। বরং একটু একটু করে, সংকেত দিয়ে দিয়ে, তিলে তিলে হত্যা করেছে তাদের। প্রায় প্রত্যেককে নিজেদের তৈরি ফাঁদেই ফেলেছে মণি। যে বিস্ফোরণের আয়োজন মনু মণির জন্য করেছিল, সেই বিস্ফোরণেই মনুকে হত্যা করেছে। বারবার ভয় দেখিয়ে দৈনন্দিন জীবনকে বিপর্যস্ত করে তার পর রাহুলকে হত্যা করেছে। পটলার নির্মিত বোমাতেই তাকে হত্যা করেছে মণি। কিন্তু আটকে গেছে বারবার তার মামাকে হত্যা করতে গিয়ে। সামনে এসেছে পবিত্র জানকীর সংসার ভেঙে যাওয়ার ব্যাপার। সদ্যোজাত শিশুর ভবিষ্যত। আর এইসব পিছুটানের কারণেই দিনেশ চৌধুরী জীবন পেয়েছে। উল্টে মণিকেই কাপালিকের কাছে হতে হয়েছে বন্দি। তার মানুষের জীবনধারণই প্রশ্ন চিহ্নের সামনে দাঁড়িয়ে গেছে।

প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষেত্রে এত দ্বিধা মনসার মধ্যে দেখি না। অথচ যে দেবীর সঙ্গে উৎপাদনশীলতার যোগ, যিনি লিঙ্গগতভাবে নারী, তাঁর মধ্যে নির্বিচারে নির্দোষ নিধনের ক্ষেত্রে কিছু দ্বিধা থাকা অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু একমুখী লোকদেবীর মতোই সরল রেখায় নিজের কার্যাবলী চালিয়ে গিয়েছেন মনসা। কিন্তু ছবিতে সর্পকন্যা মণি সেইরকমের একমুখী চরিত্র হয়ে ওঠেনি। তার মধ্যে রয়েছে দ্বিধা। তার মধ্যে ভরপুর নারীসুলভ মমতা। মনসামঙ্গলে নাগকন্যা বা নাগদেবী মনসার মধ্যে এই মমতা বিরল। 'নাগপঞ্চমী' ছবিটির শেষ অংশটিতে দেখি, মণি দিনেশ চৌধুরীকে দংশন করার পরেও তার প্রাণ ফিরিয়ে দিতে প্রযত্ন করেছে। দিনেশ চৌধুরীর কারণেই সে কাপালিকের মন্ত্রগুণে মানবী শরীর থেকে সর্পশরীর প্রাপ্ত হয়েছে জেনেও জানকীর

প্রার্থনা ব্যর্থ হতে দেয়নি। নিজের ভবিতব্যকে স্বীকার করে নিয়েই পবিত্র জানকীর শাঁখা-সিঁদুরের অস্তিত্ব রক্ষা করেছে। আর এখানেই সে হয়ে উঠেছে বিনির্মিত মনসা। শুধুমাত্র প্রতিশোধের আগুনে প্রজ্জ্বলিত হয়ে পারিপার্শ্বিক ধ্বংশলীলায় মেতে ওঠেনি মণি। নিজের ভাগ্যবিড়ম্বনার যথাসম্ভব প্রতিকার করার পরেও কোথাও একটা মানবিক আবেদনে জারিত হয়েছে মণি।

নাগকন্যা বললেই যে চিহ্নায়িত অভিব্যক্তি আমাদের মধ্যে উদয় হয়, তা আসলে মনসামঙ্গলের মনসার কারণেই নির্মিত হয়েছে। সে অভিব্যক্তিতে আমাদের মধ্যে কেবল ভয়ের সঞ্চার হয়। বিষাক্ত হয়ে পড়ার ভয়। মৃত্যুভয় ঘিরে থাকে সাপ সংক্রান্ত যে কোনো ভাবনায়। বাস্তবিক বিজ্ঞান বলে সাপ ততটা আক্রমণাত্মক নয়, যতটা আমরা মনে করি। বরং প্রাণীকুলে সরীসৃপটি একটু ভীতুদের দলেই পড়ে। বিষ আসলেই একটি উৎসেচক, যা একই সঙ্গে সাপের পাচন ও আত্মরক্ষার কাজ করে। শারীরিক দিক থেকেও খুব একটা প্রকৃতির আশীর্বাদ পায়নি প্রজাতিটি। শ্রবণশক্তি নেই। দর্শনশক্তি অতি দুর্বল। তেমন ঘ্রাণশক্তিও নেই। থাকার মধ্যে আছে কেবল ত্বক। রক্তও শীতল যা শীতকালে ভিতর থেকে শত্রুতা করে। অনেক সময় মৃত্যুর কারণও হয় এই রক্তের প্রকৃতি। তবু আমাদের প্রাণীটি সম্বন্ধে কোনো মায়া তো জন্মেই না। উল্টে বেশ ভয়মিশ্রিত শিহরণ জাগে প্রাণীটির চিন্তা আমাদের চেতনায় উপস্থিত হলে। আমরা তার সংস্পর্শ সম্পর্কে সচেতন হই।

বাঙালির সর্পভীতি কিছুটা বেশি একারণেই যে, প্রাকৃতিক ভাবেই বঙ্গদেশ সাপের বসবাসের পক্ষে পছন্দের জায়গা। আনুষঙ্গিক নানা কারণে এখানে সর্পদষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনাও বেশি। তথ্য বলছে সেই মৃত্যুর যতটা বিষের প্রতিক্রিয়ায়, তার থেকে অনেক বেশি ভয়জনিত কারণে। সেই ভয়ের বাড়বাড়ন্তের ক্ষেত্রে সর্পদেবী মনসার বিষদৃষ্টি, বিষদংশন অনেকখানি অনুঘটকের ভূমিকা বহন করেছে। কিন্তু 'নাগপঞ্চমী' ছবির মণিকে দেখলে আমাদের কোথাও ভয় জাগে না। বরং মায়া হয়। সে যেন বাঙালির চিরকালের দুই ঘরোয়া দেবী চরিত্র মনসা আর উমার সমাপতন। মণির ভাগ্যবিড়ম্বনা দেখলে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এক বারের জন্যও উপভোক্তা মন তার পক্ষ পরিত্যাগ করে না একারণেই। বারবার তার ক্ষেত্রে আমাদের অন্তর থেকেই একটা 'আহা রে' নির্গত হয়। তার এই পরিণতিই আমাদের মনকে দুস্কৃতিদের প্রতি কঠিনতর করে তোলে। আবার শেষ মাথায় যখন মণি কাপালিকের মন্ত্রগুণে সম্পূর্ণ সাপে রূপান্তরিত হয়েছে, তখনও তার সর্পিল গতিবিধিতে আমাদের মনে স্টক রেসপন্স

থেকে শিহরণ আসে না। বরং অন্তরের একটা প্রার্থনা সংযুক্ত হয়ে যায় অনুতাপদগ্ধ প্রায়শ্চিত্তকামী দিনেশ চৌধুরীর প্রার্থনার সঙ্গে। আর এভাবেই মনসামঙ্গলের একটা বিপরীত তাৎপর্য আমাদের কাছে মূর্ত হওয়া ওঠে।

বর্তমান পরিচ্ছেদটিতে আমরা দেখিয়েছি মনসামঙ্গল কাব্যে মনসা কেবল আপন অভিপ্রায় পূরণের নিমিত্তে নিঃসীম বিদ্বেষ পোষণ করেছেন ও তা চরিতার্থ করেছে সংজ্ঞাহীন নিষ্ঠুরতার মধ্যমে। কিন্তু চলচ্চিত্রে বারবার সেই নাগমূর্তি আবির্ভূতা কল্যাণকামী শক্তি হিসেবে। লোকজীবনে ফার্টিলিটি কাল্টের মধ্যে যে মনসার চিরকালীন অবস্থান, মনসামঙ্গল কাব্যে সেই অবস্থান ততখানি স্পষ্ট না হলেও চলচ্চিত্রে হয়েছে। হাপুতির পুত্র হয় যে মনসার কৃপায়, তার নিদর্শন মনসামঙ্গলে দৃষ্টান্তগতভাবে বিরল। অথচ সিজ বৃক্ষে মনসাপুজো যুগ যুগ ধরে লোকসমাজ করে আসছেন মনসার সঙ্গে প্রজন্ম রক্ষার সেই সম্পর্ককে মাথায় রেখেই। আমরা এই পরিচ্ছেদে দেখিয়েছি সেই লোকবিশ্বাস দৃশ্যায়িত হয়েছে। যে অপ্রাপ্তি মনসাকে সহজকোপী দেবীতে রূপান্তরিত করেছিল, সেই অপ্রাপ্তির সীমারেখার মধ্যেও চলচ্চিত্রের নাগকন্যারা কল্যাণমূর্তি প্রদর্শন করেছে। এভাবেই একটা মনসামঙ্গল কাব্যের বিপরীত অর্থের তল নির্মিত হয়েছে বাংলা চলচ্চিত্রে। সেখানে আমাদের মনসার প্রত্নপ্রতিমাকে দেখলে হৃদয় দয়ার্দ্র হয়। আমাদের মন কান্নায় ভিজে আসে। আমরা পরিচ্ছেদটিতে উচ্চারণ করেছি চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে নির্মাতারা বারবার মনসাসুলভ চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে বাঙালির দুই বিশ্বাসের আইকনিক চরিত্রের মধ্যে সমাপতন ঘটিয়েছেন। একটি যদি মনসা হন, অপরটি নিঃসন্দেহে উমা। একটা ঘরোয়া কন্যাকল্প চরিত্রায়ন বাংলা চলচ্চিত্রে মনসাসুলভ বিষ-অধিকারিনী চরিত্রের সঙ্গে বারবার সংযুক্ত করেছেন চলচ্চিত্রকাররা। এও এক ধরণের ভাঙন। মনসামঙ্গলের আদি ব্যক্তিত্ব ছেড়ে বেরিয়ে আসার সচেতন প্রচেষ্টা।

চ তু র্থ প রি চ্ছে দ

মনসা ফ্যান্টাসি : চলচ্চিত্রে ভরকেন্দ্র বদল

আলোচনার প্রথমেই আমরা বাংলা ছবিতে মনসামঙ্গলের ঐতিহ্য নিয়ে কথা প্রসঙ্গে উচ্চারণ করেছিলাম, বাংলা ছবিতে সাপের দৃশ্যায়নে বারবার এসেছে সাপের মণি,

সাপের লেজ খসা, বিষদৃষ্টি, সম্মোহন, সাপের দুগ্ধ পান, বীণের সুরে সাপের নাচ বা আকৃষ্ট হয়ে ছুটে চলে আসার মতো প্রসঙ্গগুলি। আমরা একবিংশ শতকে পৌঁছানোর অনেক আগেই জেনে গেছি এগুলি সবই অবৈজ্ঞানিক। অর্থাৎ বিজ্ঞান সমর্থিত বিষয় নয়। সাপের শ্রবণশক্তি এত দুর্বল যে, বীণের সুরে প্রতিক্রিয়া জানানো প্রাণীটির পক্ষে অসম্ভব। সাপের খোলস পরিত্যাগ সম্ভব হলেও টিকটিকির মতো পুচ্ছ পরিত্যক্ত হয় না। সাপ স্বভাবতই মাংসাশী। দুধে তার কোনো রুচি নেই। সাপের দৃষ্টিশক্তিও অতি নগন্য। সেই দৃষ্টিতে বিষের সঞ্চারের প্রশ্নই নেই। নাগমণি একান্তই কল্পবস্তু। তার অস্তিত্ব জগতের কোনো সর্পপ্রজাতির মধ্যেই গোচর করা যায় না। তবু বাংলা ছবিতে এই বিষয়গুলো বারবার অনুসৃত হয়েছে কেন, সে বিষয়ে আমাদের প্রশ্ন জাগরূক হয়। প্রসঙ্গত এই বিষয়গুলি অত্যন্ত বেশি মাত্রায় এসেছে এমন একটা ছায়াছবির উল্লেখ আমরা করতে পারি।

মোহম্মদ সালাউদ্দিন ফারুক, মোহম্মদ জিয়াউদ্দিন, মোহম্মদ ইফতেখারউদ্দিন এবং মোহম্মদ রোফিউদ্দিনের সম্মিলিত প্রযোজনায় এফ. কবির চৌধুরীর নির্দেশনায় ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশে মুক্তি পায় 'শীষ নাগ'[১০] ছবিটি। অভিনয় করেছিলেন অলিভিয়া, রোজিনা, ওয়াসিম, আদিল, চন্দনার মতো বাংলাদেশের তৎকালীন জনপ্রিয় কলাকুশলীরা। ছবিটির কাহিনি, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছিলেন দেলোয়ার জাহান ঝন্টু।

ছবির কাহিনিতে পাতাল রাজ্যের শয়তান যাদুকর জাবরা জানতে পারে একমাত্র শীষ নাগের মাথার মণি সংগ্রহ করতে পারলেই সে হয়ে উঠতে পারবে জগতের শ্রেষ্ঠ যাদুকর। আর তাহলেই পৃথিবীর সমস্ত সুন্দরী আর সমস্ত সম্পদে গড়ে উঠবে একচ্ছত্র অধিকার। সেই মতো প্রেমরত শীষ নাগ ও শীষ নাগিনীর কাছে উপস্থিত হয়ে বলপূর্বক শীষ নাগের মাথার মণিটি ছিনিয়ে নেয়। এতে শীষ নাগ অচেতন হয়ে পড়ে। তার প্রাণ সংশয় দেখা দেয়। বলবৃদ্ধি করে জাবরা চালাতে থাকে তার শয়তানি চাহিদার পরিতোষসাধন। অন্যদিকে লম্পট পিতার বীর পুত্র সোহেল (ছবিতে ওয়াসিম) রাজ্যের সুরক্ষায় নিযুক্ত। শীষ নাগের অচেতন দশা প্রাপ্তির পর নাগিনী ঠিক করে সে জাবরার থেকে শীষ নাগের মাথার মণি ছিনিয়ে আনবেই। একই সঙ্গে সে জাবরার মতো দুশ্চরিত্র সমস্ত মানুষকে সংহার করবে। এই জন্য ইচ্ছাধারী নাগিনী হয়ে সে উপনীত হয় সোহেলদের রাজ্যে। সেখানে একে একে অসাধু ব্যক্তিদের সে সংহার করতে থাকে। রাজা ঠিক করেন শীষ নাগিনীকে তিনি ধরবেন। কিন্তু শীষ নাগিনীর

দংশনে তিনি নিজেই মৃত্যু পথগামী হয়ে ওঠেন। জানা যায় তাঁকে জীবন ফিরিয়ে দিতে পারে একমাত্র শীষ নাগ। তাঁর মেয়ে শিলা (ছবিতে অলিভিয়া) ভালোবাসে সোহেলকে। কিন্তু শিলার প্রতি নজর রয়েছে শয়তান দুশ্চরিত্র মালুর (ছবিতে আদিল)। শিলা নির্গত হয় শীষ নাগের খোঁজে। সোহেল নির্গত হয় শিলাকে সহায়তার জন্য। শীষ নাগিনী খুঁজতে থাকে জাবরার থেকে শীষ নাগের মাথার মণি ফিরিয়ে নিয়ে আসার উপায়। প্রয়োজনের নির্বন্ধে প্রায় সকলেই একটি সরলরেখায় উপস্থিত হয়। শীষ নাগের মণি জাবরার কাছ থেকে উদ্ধারও করা না গেলে শীষ নাগ চেতনায় ফিরবে না। শীষ নাগ চেতনায় না ফিরলে শীলার পিতার জীবন লাভ অসম্ভব।

কাহিনি ক্রমে এই নতুন সৃষ্ট সরলরেখা মাফিক এগোতে থাকে। এরই মধ্যে সমুদ্রের হুরী (ছবিতে চন্দনা) তাদের সহায়তায় এগিয়ে আসে। শিলাকে নিয়ে তার সহায়তায় সোহেল জাবরার ডেরায় পৌঁছায়। সেই হুরীও সোহেলের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। জাবরার সঙ্গে যুদ্ধ ও কৌশল দিয়ে সোহেল ছিনিয়ে নেয় শীষ নাগের মণি। যাদু দিয়েই সমস্ত কিছু নিজের কব্জায় করতে ও অদৃশ্য হতে সমর্থ যাদুকর জাবরা কী কারণে সোহেলের সঙ্গে তলোয়ার নিয়ে লড়াই করে পর্যুদস্ত হওয়া পছন্দ করলেন, তার উত্তর আমরা অবশ্য এই ছবিতে আমরা পাই না।

যাই হোক এর পর সবটাই পোয়েটিক জাস্টিসে চলতে থাকে। জাবরা নিহত হয়, শীষ নাগ চেতনা ফিরে পায়, শিলার পিতা নবজীবন লাভ করেন, শীষ নাগিনীর দংশনে ধর্ষণোদ্যত মালু নিহত হয়, সোহেলের পিতা লাম্পট্য দোষ থেকে নিজেকে মুক্ত করেন সেই মুহূর্তেই, সোহেল আর শিলার মিলন হয়, মিলন হয় শীষ নাগ আর শীষ নাগিনীরও। শুধু কোল্যাটারাল ড্যামেজ হিসেবে হুরীর মৃত্যু হয় জল ছাড়া দীর্ঘ সময় বাইরে থাকার জন্যে। তার অপসারণ না হলে সোহেল আর শিলার মিলনটাও নিরঙ্কুশ হত না।

ছবিটির পর্যালোচনায় আমরা মনসামঙ্গলের মধ্যে প্রদীপ্ত ফ্যান্টাসির নানা মাত্রা লক্ষ করতে পারি। কাহিনির কেন্দ্রেই রয়েছে একটি নাগমণি। মনসামঙ্গল বাঙালির ফ্যান্টাসির সঙ্গে এই নাগমণি, বেহুলার জাঁতির আঘাতে কালনাগিনীর পুচ্ছ খসে পড়া, সাপের বিষ শোষণ করে পুনরায় জীবনদানের মতো ঐতিহ্যগুলি লিপ্ত করে দিয়েছে। বাঙালির লোকজীবনের প্রাত্যহিকতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে আছে বিষয়গুলি। সেই লোকজীবনের অভিব্যক্তি নিয়ে যখন সেই লোকজীবনের কাছাকাছি ছবির নির্মাতাগন নিজেদের সৃজনের উপভোক্তা সন্ধান করতে যান, তখনই বিষয়গুলি ছবিতে অন্তর্ভুক্ত

হওয়ার দাবিদার হয়ে ওঠে। লোকজীবনে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নিরপেক্ষ ভাবে মানুষ যেগুলি বিশ্বাস করতে চান, সেগুলিই তাঁদের লোকজ সংস্কৃতির আদল গড়ে তোলে। লোকজীবনের মানসিক গঠনের সঙ্গে ওই বিশ্বাসগুলি লগ্ন হয়ে পড়ে। সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ হাজির করলেও ওই লগ্ন বিশ্বাসগুলি থেকে তাঁদের সরিয়ে আনা সম্ভবপর হয় না অনেক ক্ষেত্রে। হলেও সেই পরিবর্তন বা বিশ্বাসের বিসর্জন খুবই ধীর লয়ে ঘটতে থাকে। সেই কালপর্বে চলচ্চিত্রায়িত মনসামঙ্গলের উত্তরাধিকার অবৈজ্ঞানিক বিষয়ের সমাহারে গড়ে উঠবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের দেখতে হবে লোকজীবনের মগ্ন চৈতন্যের মধ্যে সমাহিত ওই সমস্ত মনসামঙ্গলের উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত বিশ্বাসগুলো ছবিতে তুলে ধরার ক্ষেত্রে কোনো ভাঙনের পথ আশ্রয় করছেন কিনা চলচ্চিত্রকাররা। কোথাও নতুন কোনো ব্যাখ্যা দিতে চাইছেন কিনা তাঁরা। সে বিষয়েই আমাদের কিছু ভিন্ন পাঠ চোখে পড়ে।

প্রথমত, মনসামঙ্গলের ফ্যান্টাসির সবটুকুই দৈবী প্রভাবজাত। কিন্তু চলচ্চিত্রে বেশ কিছু জায়গায় আমরা কার্যকারণের গুরুত্ব অনুভব করতে দেখি নির্মাতাদের। পূর্বেই আমাদের আলোচিত একটি ছবি, যার নাম 'নাগ পূর্ণিমা', সেখানে দেখি মঙ্গলকে সর্পদংশন থেকে রক্ষা করার জন্য প্রাত্যহিক খাদ্যতালিকায় তিল পরিমাণ বিষ প্রয়োগের নিদান দেওয়া হয়েছে। যদি তিল পরিমাণ বিষ প্রতিদিন শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়, তবে একদিকে বিষের প্রতি আসক্তি হয়ত আসবে, কিন্তু একই সঙ্গে রক্তে বিষের অ্যান্টিবডিও তৈরি হওয়ার কথা। সেটি হলে তা বহিরাগত বিষের অ্যান্টিজেন প্রতিরোধে সক্ষম হবে বিজ্ঞানসম্মত ভাবেই। একই সঙ্গে তার মধ্যে বিষগুণও ফুটে উঠবে, যা মঙ্গলের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। মনসামঙ্গল কেন্দ্রিক ফ্যান্টাসি নির্মাণ করতে বসেও নির্মাতারা চোখ বন্ধ করে আদি পাঠের দৈবসর্বস্বতা মেনে নেননি। আলোচনাটি তার সপক্ষে আমাদের যুক্তি।

দ্বিতীয়ত, মনসামঙ্গলের মধ্যে প্রেমের বিস্তারের বিশেষ কোনো জায়গা ছিল না। যেটুকু ছিল, তাও মূলত লখিন্দর ও বেহুলার। দেব খণ্ডে যে প্রেমের চিত্রণ, তাকে ঠিক প্রেম বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি, তার সঙ্গে মেলে না। সেখানে শৃঙ্গারের গুরুত্ব প্রবল। অথচ সংস্কৃত সাহিত্যে যে শৃঙ্গাররসপ্রকাশ, তার দুর্বল অনুসরণেও উপনীত হতে পারে না মনসামঙ্গল কাব্যের দেবতাগণের প্রেম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেখানে প্রকাশিত শৃঙ্গার ধর্ষণের নামান্তর হয়ে উঠেছে। অথচ চলচ্চিত্রে আমরা দেখেছি মনসামঙ্গলের ভিত্তিস্থানীয় বিষয়গুলি মোটামুটি এক রেখেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে

ছবিগুলিতে প্রেম একটা কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করে বসেছে। 'শীষ নাগ', 'নাগিন', 'নাগ পূর্ণিমা', 'নাগপঞ্চমীর' প্রভৃতি যে ছবিগুলি আমরা বর্তমান অধ্যায়ে আলোচনা করেছি, সবগুলির ক্ষেত্রেই আমরা একদিকে যেমন মনসামঙ্গলের লিগ্যাসি খুঁজে পাব, তেমনি দেখতে পাব প্রেম চিত্রণে আদি পাঠের অভিমুখটাই বদলে যাচ্ছে ছবিগুলিতে। সেখানে অনেক গুরুত্ব বাড়ছে নাগ-নাগিনীর প্রেম, সাপের শঙ্খ লাগার দৃশ্যায়ন, নায়ক-নায়িকার প্রেমের পুষ্টিতে নাগ-নাগিনীর সহায়তা, প্রেমের পথে ক্ষতিকর মানুষগুলিকে নাগ-নাগিনী বা নাগদেবীর শাস্তিবিধান এগুলি ছায়াছবিগুলির প্রাধান দ্রষ্টব্য ও উপভোগ্য বিষয় হয়ে উঠেছে।

তৃতীয়ত, মনসামঙ্গল কেন্দ্রিক ছবিগুলিতে সাম্প্রদায়িক সমন্বয় চোখে পড়ার মতো। 'শীষ নাগ' ছবিটিতেও দেখি ছবির সূচনাই হয় আল্লার স্তুতিতে। একই চিত্র দেখেছি 'নাগিন' ছবিটির ক্ষেত্রেও। পীরের মাজার আর সাধুবাবার থান এই ছবিগুলিতে পাশাপাশি অবস্থান করেছে বারবার। মনসামঙ্গলকে সামনে রেখে এই চলচ্চিত্র বহুমুখী হলেও মনসামঙ্গলের মতো ব্ল্যাক হিউওমারও খুব একটা প্রযুক্ত হতে দেখি না ছবিগুলিতে। একটা মার্জিত পরিশীলন এই ধারার সব ছবিতেই লক্ষ করা যায়। মনসামঙ্গলের দেব-দেবীগণ মনসামঙ্গলে যতখানি রক্ত মাংসের লিবিডো তাড়িত মানুষ মানুষ গড়নের, ছায়াছবির কেন্দ্রীয় মানুষগুলো বিশুদ্ধতায় ততখানিই দেব-দেবী গন্ধী। এ যেন উত্তরাধিকারের পথে দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা। একেও তো পাঠ ভাঙা বিনির্মাণই বলতে হয়!

বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা মনসামঙ্গল কাব্যের ছায়ায় গড়ে ওঠা বাংলা চলচ্চিত্রের মিশ্র দিকের পর্যালোচনা করেছি। আমরা দেখিয়েছি চলচ্চিত্রে মনসামঙ্গলের ফ্যান্টাসি আসলে কীভাবে গৃহীত হয়েছে। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে নির্মাতারা খেয়াল রেখেছেন, তাঁদের সৃজনের দ্রষ্টারা বিজ্ঞাননির্ভর জীবন যাপন করেন। ফলে মনসামঙ্গলের সীমাহীন ফ্যান্টাসিকে দৃশ্যায়িত করার থেকে নিজেদের সৃজনী চৈতন্যকে সংযত করেছেন। তার পরিবর্তে তাঁদের মনোযোগ অধিক আকৃষ্ট হয়েছে প্রেম কাহিনির চিত্রায়নে। বেহুলা কর্তৃক লোহার কলাই রান্না করার থেকে অনেক বেশি তাঁরা মনোযোগ দিয়েছেন নাগ-নাগিনীর প্রেম চিত্রণের দিকে। নাগমণি, লেজখসার মতো ফ্যান্টাসি বাংলা চলচ্চিত্রেও আছে। কিন্তু বেশি জায়গা করে নিয়েছে নাগ-নাগিনীর প্রেম, বা সর্পসংকুলতার মধ্যে

মানব-মানবীর প্রেম। অর্থাৎ ফ্যান্টাসি চলচ্চিত্রেও আছে। কিন্তু মনসামঙ্গল কব্যের মধ্যে যে ফ্যান্টাসি, তার থেকে ভরকেন্দ্র সরে গেছে।

বর্তমান অধ্যায়ে আমরা প্রথমেই এই বিতর্কের সমাধান করার চেষ্টা করেছি, চলচ্চিত্রকে আমরা সাহিত্য-সংরূপ হিসেবে ধরতে পারব কিনা। ধরতে হলে কোন দিক থেকে ধরতে হবে ইত্যাদি। ব্যাপারগুলির একটা যুক্তিসম্মত দিক দেখানোর আলোচনা করেছি। সেটাই একমাত্র ঠিক, এমন দাবি আমরা করছি না। কিন্তু আমাদের দেখানো যুক্তিগুলোও একটা দিক হতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস। পরবর্তীতে আমরা চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে মনসামঙ্গলের ছায়ায় নির্মিত একাধিক চলচ্চিত্রের ঘটনাধারার মধ্যে নির্মাতারা কীভাবে মনসামঙ্গলের নানামুখী ভাষ্য প্রস্তুত করেছেন, তা পর্যালোচনা করেছি। দেখিয়েছি সেই সমস্ত ভাষ্য কোথাও মনসামঙ্গলের বিপরীত অর্থ নির্মাণ করেছে, কখনো বা মনসামঙ্গলে অনুপস্থিত অর্থের বোধ এনেছে। অধ্যায়টিতে আমরা মূলত ছবিগুলির কাহিনির মধ্যেই আমাদের পর্যালোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছি। চলচ্চিত্রের সংশ্লিষ্ট কৃত-কৌশলের পর্যালোচনা প্রাসঙ্গিক নয় বিচার করেই পরিত্যক্ত হয়েছে।

সূত্র ও টীকা

১. ভট্টাচার্য, গুরুদাস, ২০০৭, চলচ্চিত্রের ভাষাতত্ত্ব ও অন্যান্য, কলকাতা, চিত্রলেখা প্রকাশনী, পৃ. ৫৪

২. তদেব, পৃ. ৫৮

৩. সিনেমা সৌজন্য : ইউটিউবের আলমগির ভুইয়ার চ্যানেল, প্রকাশিত ২০ অক্টোবর, ২০১৮)

৪. ইউটিউব থেকে 'অনুপম মুভিজ' চ্যানেলের সৌজন্যে প্রাপ্ত, প্রকাশ : ৩১ মার্চ, ২০১৮)

৫. ভট্টাচার্য, শ্রীবিজনবিহারী (সম্পাঃ), ২০১১, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি, পৃ. ১০৯

৬. চলচ্চিত্র সৌজন্য : ইউটিউবে 'শেমারু বেঙ্গলি' চ্যানেলের সৌজন্যে প্রাপ্ত, প্রকাশ ২৪ এপ্রিল, ২০১৭

৭. বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পাঃ),২০০৯, বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল, কলকাতা, অঞ্জলি পাবলিশার্স, পৃ. ৯৪

৮. তদেব, পৃ. ৯৮

৯. তদেব, পৃ. ১১০

১০. চলচ্চিত্র সৌজন্য : ইউটিউবে 'জাহাঙ্গীর কবির' চ্যানেলের সৌজন্যে প্রাপ্ত, প্রকাশ : ৩ নভেম্বর, ২০১৮